সুখেঅসুখে
স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকাশনা

৫ম বর্ষ নভেম্বর ২০১৪ সংখ্যা ২১

তবুও অপরাজিতা

নারী

নারীর ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ

নারীর ঝুঁকি 'অস্টিওপোরোসিস

স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও করণীয়

বন্ধ্যাত্বকে জয়, জন্ম জয়

বিষণ্ন মনঃ কী করি

জানা অজানার ইবোলা ভাইরাস

5th International Conference on
Cardiology and Cardiac Surgery
& 3rd Dhaka Live 2014

ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল আয়োজিত

কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক সার্জারি বিষয়ক

৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং তৃতীয় ঢাকা লাইভ-২০১৪

পঞ্চমবারের মতো আগামী ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক কার্ডিওলজি এবং কার্ডিয়াক সার্জারি সম্মেলন ২০১৪। এবারের প্রতিপাদ্য 'Bid To Break The Barrier'। আসছে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করার জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এডভোকেট আব্দুল হামিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

প্রি কংগ্রেস ওয়ার্কশপ এবং পোস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কশপসহ মূল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ৫ টি সেশনে। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জার্মানি, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, মালয়শিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, সাউথ কোরিয়া, শ্রীলংঙ্কা, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও তুরস্কের প্রথিতযশা কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জনগণ অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও বাংলাদেশের হয়ে অংশগ্রহণ করবেন দেশের বরেণ্য কার্ডিওলজিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জনগণ।

সূচিপত্র

৫ম বর্ষ নভেম্বর, ২০১৪ সংখ্যা ২১

বিষণ্ন মন: কী করি ৫

নারীর ঝুঁকি 'অস্টিওপোরোসিস' ৯

জানা অজানার ইবোলা ভাইরাস ১৩

নারীর মূত্রতন্ত্রের বিশেষ রোগ ১৫

বয়সভেদে নারীর খাদ্যপুষ্টি ১৭

স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও করণীয় ১৮

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ ২১

ঝুঁকিপূর্ণ প্রেগনেন্সি ও করণীয় ২৩

মেনোপজ বৃত্তান্ত ২৪

বন্ধ্যাত্বকে জয়, জন্ম জয় ২৭

রক্তস্বল্পতার অল্প কথা ২৮

অফিসেই ব্যায়াম ৩০

সুখে অসুখে

সুখে অসুখে

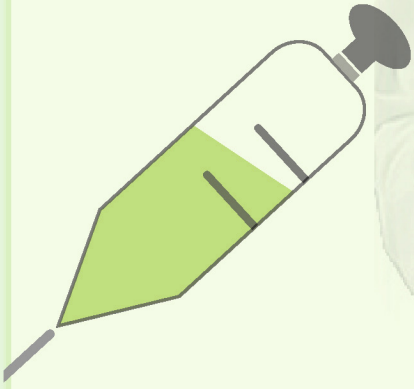

সম্পাদকীয়

কন্যা শিশু বড় হতে থাকে। আস্তে ধীরে সে পা দেয় কৈশোরে। মেয়েটি নারী হয়ে ওঠে এক সময়। তার নতুন ঘর হয়, সংসার হয়। এবার কখনো সে স্ত্রী, কখনো মমতাময়ী মা। গোটা সংসারের হাল শক্ত হাতে তিনি ধরে রাখেন। সংসারের ঘানি টানতে টানতে এক সময় তার হাত দুর্বল হয়ে আসে। রোগ ব্যাধি এসে ঘিরে ধরে। সেই সময় দরকার নারীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও চিকিৎসকের দেখভাল।

কন্যা শিশুটি যখন বয়সন্ধিকালে পৌঁছায়, তখন তার শারীরিক ও মনোজগতে বিশেষ পরিবর্তন আসে। গর্ভকালীন সময়েও নারী বিস্ময়কর এক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। ভারী গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টায় নারীর প্রতি হতে হবে সহানুভূতিশীল এবং চিকিৎসকের সংস্পর্শে আনতে হবে।

এ ছাড়া মেনোপজ পরবর্তি সময়েও নারী নানা শরীরিক জটিলতার সম্মুখীন হয়। এ ছাড়া নারীর আলাদা শরীরিক গঠন ও শরীরে বিশেষ কিছু হরমোনের উপস্থিতি থাকায়, তাদের সব সময়েই কিছু রোগ হবার প্রবণতা থাকে। পরিবারের সচেতনতা প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও চিকিৎসা সহায়তা নিলে এসব রোগ ব্যাধি সহজেই এড়ানো সম্ভব।

এবার সুখে অসুখের পুরো সংখ্যাটিই সাজানো হয়েছে নারীকে ঘিরে। আশা করি এবারের সংখ্যাটিও পাঠকদের ভালো লাগবে।

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ফোন : 8610793-8, *ফ্যাক্স* : 88-02-9615497
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, *ওয়েব* : www.labaidgroup.com

বিষণ্ন মনঃ কী করি

অধ্যাপক ডাঃ মোহিত কামাল
প্রফেসর অব সাইকোথেরাপি
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

ভোররাতে ঘুম ভেঙেছে জেসমিনের তবুও শুয়ে আছে বিছানায়। বালিশ জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলেও সতেজতা নেই মনে। সূর্য এখন অনেক উপরে উঠে গেছে। জানালা দিয়ে রোদের জোয়ার ঢুকছে। মশারি উল্টে আছে খাটের পাশে। একটা বালিশ নীচে পড়ে রয়েছে, বেডকভার দুমড়ানো। রুমে ঢুকে হোঁচট খেলেন শাহিদা চৌধুরী।

পেরেক থেকে ফিতা তুলে মশারি খুলে নিলেন তিনি। খাটের পাশে বসে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। আলতো হাতের ছোঁয়া দিয়ে ডাকলেন, মা-মণি ওঠো। বেলা হয়েছে।

ঝট করে মায়ের হাত ছুড়ে দিল জেসমিন। ১৪ বছরের নবম শ্রেণির ছাত্রী হঠাৎ করে যেন কেমন হয়ে গেছে।

শাহিদা চৌধুরী কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। কয়েক সপ্তাহ ধরে মেয়ের হাবভাব তার কাছে অন্যরকম লাগছে। কিছু একটা হয়েছে, বুঝতে পারলেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছেন না।

জানালার ওপর একটি হালকা বিছানার চাদর ঝুলিয়ে দিলেন তিনি। রোদের দাপট কমে গেল রুমে। হালকা আলো তবুও ঢুকছে। ফিরে আসার সময় পড়ার টেবিলের কোনে ধাক্কা লাগায় টেবিল থেকে নীচে পড়ে গেল জ্যামিতি বক্স।

ঝনঝন শব্দ শুনে দ্রিম করে লাফিয়ে উঠল জেসমিন। ক্ষুব্ধ চোখে তাকাল মায়ের দিকে। আবার ঝপাং করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আচমকা চিৎকার দিয়ে বলল, কেন এসেছ আমার রুমে?

শাহিদা চৌধুরী জবাব না দিয়ে চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলেন মেয়ের কর্কশকণ্ঠ, আর কখনো আসবে না আমার রুমে।

বিরক্তি নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল জেসমিন। চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জড়ানো বালিশটি ছুড়ে মারল দরজার দিকে; গায়ে লাগায় হালকা চোট পেলেন শাহিদা চৌধুরী। তবুও নীরব রইলেন।

বালিশটি হাতে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। মা চলে যাওয়ার পর ঝট করে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল জেসমিন।

মেয়ের মন ভালো নেই। মারও মন খারাপ এ কারণে। সকাল আটটায় নাশতা সাজানো থাকে টেবিলে। পরিবারের সবাই একত্রে ব্রেকফাস্ট করে প্রতিদিন। কয়েকদিন ধরে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে। সাড়ে আটটা বেজে গেছে, অথচ এখনো ডাক আসছে না নাশতার। রুম থেকে বেরিয়ে এলেন জেসমিনের বাবা, আহসানুজ্জামান।

ডাইনিং টেবিল শূন্য। নাশতা দেওয়া হয়নি। ডাইনিং রুমে বসে তিনি হাঁক ছাড়লেন, এখনো নাশতা হয়নি?

কোনো উত্তর পেলেন না। বাড়ি এত চুপচাপ কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। তারপর মেয়ের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজা এখনো ভেতর থেকে বন্ধ! এতো বেলা পর্যন্ত কি জেসমিন ঘুমাচ্ছে? ভেবে দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে ডাকলেন মেয়েকে।

মা-মণি, উঠেছ?

জেসমিন কোনো উত্তর দিচ্ছে না। জেগে আছে, অথচ উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না তার। উঠে যে দরজা খুলবে সে তাগিদও পাচ্ছে না।

আবার টোকা দিলেন আহসানুজ্জামান।

মা-মণি,এসো, নাশতা খাব। উঠেছ?

অনেকক্ষণ পর উঠে এলো জেসমিন। চুল এলোমেলো। মুখে ক্লান্তির ছাপ। দরজা খুলে ফিরে যাচ্ছিল সে খাটের দিকে।

ঘুম শেষ হয়নি তোমার? নাশতা খাবে না বাপির সঙ্গে?

না। গম্ভীর স্বরে বলল জেসমিন। তুমি খেয়ে নাও। আমি পরে খাব।

মেয়ের জবাব শুনে চমকে উঠলেন আহসানুজ্জামান। এমন স্বরে তো মেয়ে কথা বলে না কখনো। হঠাৎ কী হলো মেয়ের?

ফিরে এসে চুপচাপ বসে থাকলেন টেবিলে।

শাহিদা চৌধুরী নাশতা দিয়েছেন টেবিলে। স্বামীর সঙ্গে কথা না বলে টেবিলে বসে একাই খেতে শুরু করলেন তিনি।

তবে কি মা-মেয়েতে ঝগড়া হয়েছে? আহসানুজ্জামান নিজেকে প্রশ্ন করেন। অপরপক্ষ নীরব।

অনেকদিন ধরে মেয়ের মেজাজের কারণে পারিবারিক আবহাওয়া বদলে গেছে। বদলের কারণ এখনো কারো জানা নেই।

স্কুলে যাচ্ছে না মেয়ে। সারাদিন নিজের ঘরে থাকে। বাইরেও বেরোয় না। বান্ধবীদেরও খোঁজ নেয় না। দৈনন্দিনের আনন্দধারা থেকে ছিটকে নিজের একাকী জগতে ঢুকে আছে সে।

মনঃবিশ্লেষণ

দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা ঘটনায় জড়িয়ে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। আবার সহজে ভালোও হয়ে যাওয়ার কথা মন। কিন্তু ভালো হচ্ছে না জেসমিন। কয়েক সপ্তাহ ধরে তার মনের মধ্যে বিষাদ চেপে বসেছে। এটি কি স্বাভাবিক?

আমরা দেখলাম জেসমিনকে। তার রাগ দেখলাম, বিরক্তি দেখলাম। ঘুমের সমস্যা দেখলাম। খাবারের প্রতি অনাগ্রহ দেখলাম। তার আচরণেও অনেক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টিনএজ সন্তানের এমন উপসর্গগুলো মা-বাবাকেই ধরতে হবে প্রথমে। তাদের মনোজগতের ঝড়, কষ্ট, রাগ, বিরক্তি, বিদ্রোহী মনোভাব কৌশলে সামাল দিতে হবে। প্রয়োজনে নিতে হবে প্রফেশনাল হেলপ, মনঃচিকিৎসায় এ ধরনের সমস্যাগুলোর যথাযথ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সম্ভব।

জেসমিনের বৈশিষ্ট্য এমন ছিল না। ধীরে ধীরে জেসমিনের আলোকময় জগতে বিষণ্নতা রোগ বাসা বেঁধেছে। বুঝতে হবে জেসমিনের সমস্যা। সচেতন বাবা-মাকে নিজের সন্তানের এ ধরনের পরিবর্তনে সচেতন হতে হবে। কুসংস্কারের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে সঠিক সময়ে। দীর্ঘ যাতনায় ডুবে থাকলে সন্তান নিজের দায়িত্ব পালনের পথ থেকে ছিটকে যাবে, পিছিয়ে যাবে জীবনযুদ্ধে।

অনেক টিনএজার নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না। অসহ্য যাতনা থেকে রেহাই পেতে মাদকের সঙ্গে সখ্য করে, অ্যালকোহলও পান করে বিত্তশালী কিংবা বস্তির কিশোররা।

নিজের অনুভূতির কথা কী প্রকাশ করতে পারে রোগী?

মা-বাবাকে টিনএজার সমস্যার প্রতি নজর রাখতে হবে। আবারও বলছি, অতি নজর নয়, প্রয়োজনে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। কিভাবে সন্তান নিত্যদিনের সমস্যা বা নানা ধরনের অনুভূতি মোকাবিলা করছে, বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। উঠতি বয়সী টিনএজাররা যখন নিজের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে যায়, কাউকে প্রকাশ করে কষ্টের কথা, ব্যক্তিগত অনুভূতি শেয়ার না করে একাকী থাকে, তখন বুঝতে হবে সমস্যার জট তৈরি হচ্ছে। ঘনীভূত হচ্ছে তা আস্তে আস্তে।

সমস্যার ঘেরাটোপে এঁটে যাওয়া টিনএজার-মনে, চিন্তা বা ধারণায় কি আত্মহত্যার চিন্তা জাগছে? পরিকল্পনা করছে কি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার?

টিনএজের সন্তানরা বিষণ্নতার কারণে বলতে পারে, 'বেঁচে থেকে কি হবে?' 'পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ কী?' 'জীবন এতো বিষাদময় যে, মনে হয় ছেড়ে যাই সব। এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি বা অনুভূতিগুলো ক্ষণস্থায়ী হলেও গুরুত্ব দিতে হবে। সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। সাপোর্টিভ হতে হবে। তির্যক সমালোচনা থেকে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হবে। সাপোর্টিভ হলে নিজেকে সে আলাদা করতে পারবে না। নিজের অনুভূতি বা পরিস্থিতির ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে শিখবে, নিজের ডুবে যাওয়া পরিস্থিতির ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে শিখবে, ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারবে। সুইসাইডের ইচ্ছে এমনি এমনি চলে যায় না। চারপাশের সহযোগিতার মাধ্যমেই আত্মহত্যার মতো নির্মম চিন্তাগুলো বদলানো যায়।

বিষণ্নতা কি স্থায়ী হতে পারে?

সাধারণত 'মন খারাপ' কিংবা 'বিষাদ', 'ভালো লাগা' বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যদি বিষণ্নতা, মন খারাপ জোরালো হয়, দিনের বেশির ভাগ সময়ব্যাপী থাকে কিংবা একনাগাড়ে দুই সপ্তাহ পেরিয়ে যায় তাহলে সাহায্যের জন্য মনোচিকিৎসকের কাছে দোদুল্যমানতা ছেড়ে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিষণ্নতা রোগের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হচ্ছে স্থায়ী অসুখী অনুভূতি, স্বাভাবিক কাজ করার অনাগ্রহ-অক্ষমতা, অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা ইত্যাদি।

কী করা উচিত?

টিনএজার নিজেকে হননের উদ্যোগ নিলে অবশ্যই বাবা-মাকে সক্রিয় হতে হবে। বুঝতে দিতে হবে, সে একা নয়। জোরালোভাবে এই অনুভূতি জাগাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে মনোচিকিৎসকের কাছে হাজির করা না যায় ততক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। চিকিৎসার পরও সতর্কতা কমানো যাবে না, পরিপূর্ণ চিকিৎসা শেষ করা না পর্যন্ত নজর রাখতে হবে। মনে রাখা জরুরি, আত্মহত্যার চিন্তা, পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা মানসিক চিকিৎসার সর্বোচ্চ জরুরি অবস্থা।

বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কী ঘটছে? কী করা উচিত? যথাযথ পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাকে কথা বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে, নিজের অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ তৈরি করার প্রয়োজন বেশি।

ভালো বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যাকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে সব ধরনের অনুভূতি শেয়ার করার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে।

সন্তানের আনন্দময় বিষয়-আশয়ের সুযোগ বাড়াতে হবে, তার সঙ্গে আনন্দময় কাজে অংশ নেওয়ার কথা ভুলে গেলে চলবে না। সমস্যায় জড়িয়ে থাকা টিনএজারকে হালকা ব্যায়াম করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। রিলাক্স হওয়ার জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করা, যেমন ভালো একটি ছবি দেখা বা নতুন কোনো জায়গায় বেড়ানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

কঠিন সমস্যা মোকাবেলায় কী করা উচিত?

কঠিন সমস্যার বাস্তব সমাধানের জন্য সন্তানের সঙ্গে বসে একত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্রফেশনাল সাহায্যের কথা আলোচনা করতে হবে। এসময় খুব খেয়াল রাখতে হবে, সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে রাখতে হবে, সমস্যা শনাক্ত করা গেলে শিশু-কিশোরের বিষণ্নতা সহজে কাটিয়ে ওঠা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। পাশাপাশি সবাইকে আরো মনে রাখতে হবে, টিনএজার-বিষণ্নতা অচিন্তনীয় বা ভেঙে পড়ার মতো কোনো বিষয় নয়। এ ব্যাপারে জ্ঞানই সমস্যা উত্তরণের পথে আপনাকে এগিয়ে নেবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২৪% টিনএজার আঠার বছরের মধ্যে বিষণ্নতা রোগে ভুগতে পারে। এটি অন্যান্য সমস্যা যেমন অ্যাংজাইটি, কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার, মনঃযোগবিবর্জিত রোগের মতো অতি দুরন্ত শিশুদের বেলাও ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা জরুরি।

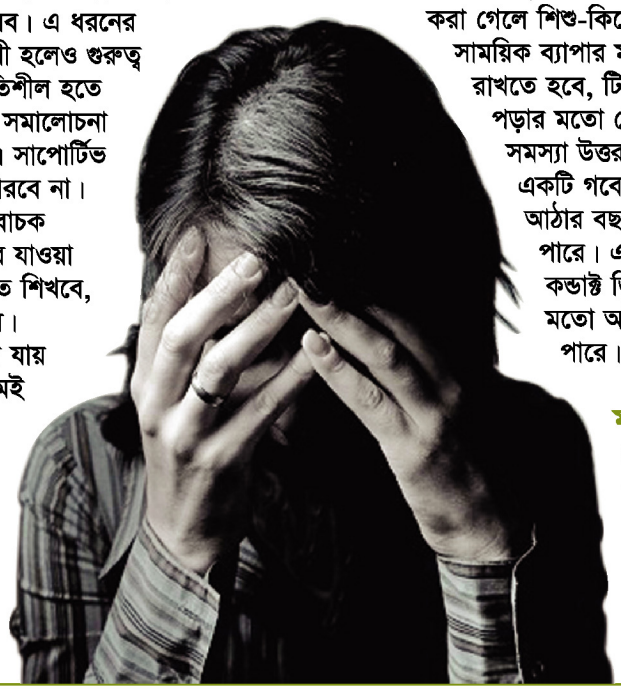

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত– ১৮ বছরের উর্ধ্বে মানসিক রোগের হার ১৬%। এদের মধ্যে গুরুতর বিষণ্নতার হার ৪.৬ শতাংশ (মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় জরিপ ২০০৩-২০০৫, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট)। পাঁচ থেকে আঠার বছরের মধ্যে

কিছু কিছু উপসর্গ আছে যা বিষণ্ন শিশুর মনের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। উপসর্গগুলো নীচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো

ঘুমের সমস্যা : এরকম ক্ষেত্রে ঘুমের সমস্যা লেগেই থাকে। বজায় থাকে না ঘুমের স্থায়িত্ব, বারবার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম আসতে চায় না। ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমাতে পারে না বিধায় সারারাত টিভির সামনে বসে থাকে। সকালের দিকে ঘুমায়। উঠে স্কুলে যেতে পারে না। অনেক সময় অসময়ে শুয়ে থাকে।

ওজন ও ক্ষুধার সমস্যা : ক্ষুধা কমে গেলে খাওয়া কমে যায়। কমে যেতে পারে খাবারের আগ্রহ। ফলে ওজন তিন কেজি থেকে বেশি কমলে সমস্যার গুরুত্ব বেড়ে যাবে। উল্টোও হতে পারে। বেশি খাবার আগ্রহ বেড়ে গেলে বেশি খাবে। তিন কেজির বেশি ওজন বাড়লেও সমস্যাটির গুরুত্ব দিতে হবে। মানসিক অসুস্থতার মূল্যায়ন করতে হবে।

দৈহিক শক্তি কমে যাওয়া, আনন্দময় জীবনযাপন হারিয়ে ফেলা: এটি বিষণ্নতার বড় একটি উপসর্গ। এই উপসর্গের কারণে দুরন্ত কিশোর কিংবা কিশোরীটি নির্জীব হয়ে যেতে পারে, গতিহীন হয়ে পড়তে পারে।

মনোযোগের অভাব, ভুলে যাওয়া : উদ্বেগ বেশি থাকলে কোনো কাজে, কথাবার্তায় কিংবা পড়ালেখায় মনঃসংযোগ রাখতে পারে না, এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায় মন। যা পড়ল, দেখল, শুনল ঠিকমতো স্মরণ করতে পারে না এ কারণেই।

খারাপ সময় : দৈনন্দিনের কোনো মানসিক চাপ নেই। এমন অবস্থায় বিশেষ একটি সময় যদি খারাপ লাগে, অশান্তি লাগে, যেমন রাতের বেলায় একাকী থাকার সময়, এরকম সমস্যা সন্তানের ভেতর দেখা দিলে বুঝতে হবে, বিষণ্নতায় ডুবে গেছে সন্তান।

খারাপ চিন্তা : আত্মহননের চিন্তা, নিজের ক্ষতির চিন্তা বা অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা সন্তানের মনের ভেতর ঘুরপাক খেলে ডিপ্রেশনের কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

মানসিক রোগের হার ১৮.৪ শতাংশ, বিষণ্নতার হার ১.০০ শতাংশ (মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় জরিপ ২০১১, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট)।

উপরের পরিসংখ্যানের পাশাপাশি মনে রাখতে হবে ঘুম কম হওয়ার কারণে তরুণ-তরুণীদের বিষণ্নতায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মেডিকেল সেন্টারের একদল গবেষক বলেছেন, যারা রাত ১০টার আগে ঘুমুতে যায় তাদের তুলনায় যারা এরপরে ঘুমায় তাদের মধ্যে বিষণ্নতায় ভোগার হার প্রায় ২৪ শতাংশ বেশি।

গবেষকরা আরো বলেছেন, যারা রাত দশটায় ঘুমুতে যায় তাদের কমপক্ষে আটঘণ্টা ঘুম হয় বলে মন থাকে প্রফুল্ল। অন্যদিকে যারা মধ্যরাতের পর ঘুমায়, তাদের মধ্যে বিষণ্নতার পাশাপাশি দেখা দেয় হুট করে মেজাজ হারানোর মতো ঘটনাও। বিশেষ করে যেসব তরুণ-তরুণী প্রতিদিন পাঁচঘণ্টা বা তার চাইতেও কম সময় ঘুমায় তাদের বিষণ্নতায় ভোগার হার ৭১ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

পর্যাপ্ত ঘুম বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যেমন প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে, তেমনি বিষণ্নতার চিকিৎসাতেও ঘুম কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম– বলেছেন গবেষণা দলের প্রধান জেমস গ্যাংস্তইস।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নেতিবাচক মূল্যায়নের কারণে ডিপ্রেশন ঘটলে মনোচিকিৎসায় ভালো ফলাফল দ্রুত অর্জন করা সম্ভব। ডিপ্রেশনের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে রোগ দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে সমস্যা জয় করা সম্ভব।

লেখক : মনোচিকিৎসক ও কথা সাহিত্যিক।

[HOTLINE : 10606]

বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট

সব বয়সের নারী পুরুষের জন্যই বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট প্রযোজ্য।

ল্যাবএইড এ ব্যবহৃত 'লুনার প্রোডিজি অ্যাডভান্সড' এর সহায়তায় আপনি সহজেই জেনে নিতে পারবেন আপনার হাড়ের স্বাস্থ্য। সব বয়সের নারী পুরুষের জন্যই জরুরি বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট। এই টেস্টে একদিকে যেমন আপনার হাড়ের সুস্থতা জানতে পারবেন অন্যদিকে হাড়জনিত রোগের আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গড়তে পারবেন।

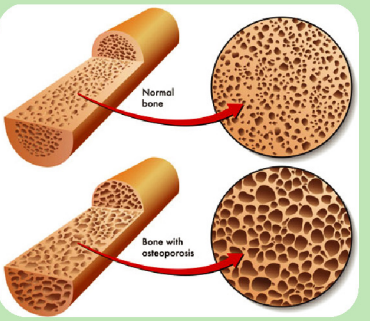

আরও জানতে

ধানমন্ডি : বাড়ি ১, রোড ৪, ঢাকা-১২০৫। **ফোন:** ৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩ **হটলাইন:** ০১৭৬৬৬৬০২০১

গুলশান : বাড়ি ১৩/এ, সড়ক-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। **ফোন:** ৮৮৩৫৯৮১-৪ **হটলাইন:** ০১৭৬৬৬৬২৫২৫

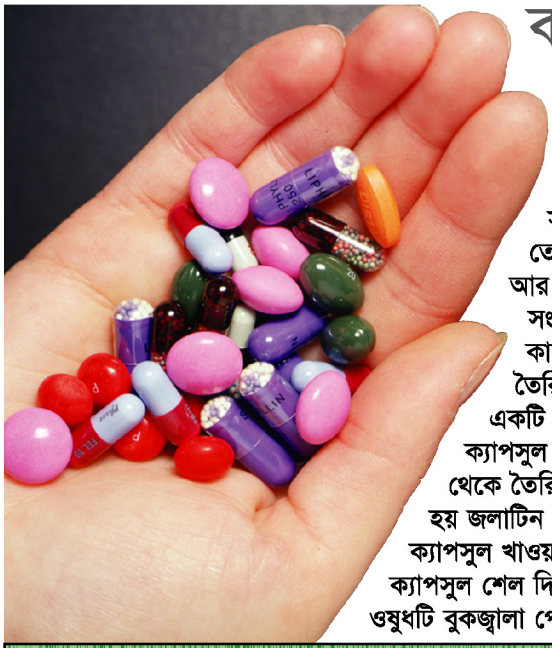

ক্যাপসুল শব্দটি ল্যাটিন থেকে এসেছে। মূল শব্দটি ছিল ক্যাপসুলা। এর বাংলা করলে দাঁড়ায় ছোট্ট বক্স। সেই ছোট্ট বাক্সেই বন্দী হতো জীবনদায়ী সব ওষুধ। তারপর ক্যাপসুল শেলের উপাদানে বৈচিত্র এসেছে। হয়েছে আরো উন্নততর। ট্যাবলেট আকারে ওষুধ খাওয়ার চাইতে ক্যাপসুলে খাওয়াটাই বরং স্বস্তিদায়ক। ট্যাবলেটে এক ধরনের স্বাদ গন্ধ থাকে। কখনো এই স্বাদ কিংবা গন্ধ সুখকর নাও হতে পারে। অন্যদিকে ক্যাপুসল অনেকটাই স্বাদ গন্ধহীন। ওষুধ যতই তেতো কিংবা কটু গন্ধের হোক না কেন, ক্যাপসুল ফরমে সেটি পাওয়া গেলে, ওষুধটি আর বিস্বাদ থাকে না। কারণ ওষুধের চারিদিকে ক্যাপসুলের বর্মটাই ওষুধগুলোকে মুখের সংস্পর্শে আসতে দেয় না। ওষুধের উপাদানগুলোকে আলো থেকে সুরক্ষা দেবার কাজটা মূলত করে ক্যাপসুল শেল। এই যে ক্যাপসুল শেল বা বর্ম এটি সাধারণত তৈরি হয় জিলাটিন নামক এক ধরনের পদার্থ দিয়ে। জিলাটিনের দুটি ভাগ আছে। একটি শক্ত জিলাটিন, অন্যটি নরম জিলাটিন। কখনো শক্ত জিলাটিন শেলে তৈরি হয় ক্যাপসুল। আবার কখনো নরম জিলাটিনেও তৈরি হয়। এই জিলাটিন বস্তুটি প্রাণীজ উৎস থেকে তৈরি হয়ে থাকে। মূলত পশুর হাড়, চামড়া বিশেষ প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে তৈরি হয় জলাটিন। এটি প্রাণীজ উৎস হওয়ায় যারা নিরামিষভূজী তাদের জন্য এই জিলাটিনে মোড়ানো ক্যাপসুল খাওয়াটা বিব্রতকর হতে পারে। ল্যাবএইড ফার্মা জিলাটিন শেলের পরিবর্তে ভ্যাজিটেবল ক্যাপসুল শেল দিয়ে তৈরি করছে ইপ্রাজল। চিকিৎসকের পরামর্শে ইসোমিপ্রাজল গ্রুপের 'ইপ্রাজল' ওষুধটি বুকজ্বালা পোড়া এবং অ্যাসিডিটি সমস্যা দূর করতে নিয়ম মেনে খেতে পারেন।

Eprazol
Esomeprazole

Eprazol

THE ESOMEPRAZOLE IN SMALLEST VEGETABLE CAPSULE SHELL

Esomeprazole 20 mg Capsule

- Easy to swallow
- Rapid onset of action
- No religious restriction for intake
- 22.5% pellets ensure maximum bioavailability

Labaid Pharma Quality First...

নারীর ঝুঁকি ‘অস্টিওপোরোসিস’

অধ্যাপক ডাঃ এম. আমজাদ হোসেন
এমবিবিএস, এমএস (অর্থো)
চিফ কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান
অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ
ল্যাবএইড আর্থোপ্লাষ্টি সেন্টার, ল্যাবএইড হাসপাতাল।

অস্টিওপোরোসিস কী?

আক্ষরিক অর্থে অস্টিওপোরোসিস বলতে বোঝায় ছিদ্রযুক্ত হাড়। এতে হাড়ে ক্যালসিয়ামের পরিমান কমে যায়, হাড়ের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমেই হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ফলে হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা বহুগুণে বেড়ে যায়। হাড়ের এই ক্ষয় সাধারণত নীরবে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটতে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক ধাপে এর কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না।
অস্টিওপোরোসিসে কোমরের হাড়, মেরুদণ্ড ও হাতের কবজির হাড় সবচেয়ে বেশি ভঙ্গুর হয়ে থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিশেষ করে মহিলাদের মেনোপজ-পরবর্তী সময়ে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রতি তিনজন মহিলার একজন এই অস্টিওপোরোসিস জনিত হাড়ভাঙ্গার শিকার হয়।

কেন অস্টিওপোরোসিস হয়?

অস্টিওপোরোসিসের বহুবিধ কারণ রয়েছে। শৈশবে হাড় গঠনের সময় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের স্বাভাবিক গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ ছাড়া হাড় গঠনে কিছুটা পারিবারিক প্রভাবও রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যায়ামের অভ্যাস ও দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্রহণের উপরও হাড়ের গঠন অনেকাংশ নির্ভর করে। এ ছাড়া বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগ ও কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেও হাড় ক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস হতে পারে।

অস্টিওপোরোসিসের উপসর্গ ও লক্ষণ

অস্টিওপোরোসিসে নীরবে হাড় ক্ষয় হতে থাকে। হাড় ভাঙ্গার মাধ্যমেই এর উপস্থিতি প্রথমবারের মতো টের পাওয়া যায়। হাড়ের ব্যথা বা অল্প আঘাতে হাড় ভেঙ্গে যাওয়াও হতে পারে অস্টিওপোরোসিসের প্রথম লক্ষণ। মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙ্গার ফলে কোমরে হাড়ের গঠনগত ত্রুটি, শরীরের উচ্চতা কমে যাওয়া- এমনকি মেরুদণ্ডের ভেতরে অবস্থিত স্নায়ুর ওপর চাপের প্রভাবে তীব্র ব্যথাও অনুভূত হতে পারে।

অস্টিওপোরোসিস শনাক্তকরণ

হাড়ের সাধারণ এক্স-রের মাধ্যমে অস্টিওপোরোসিস ধারণা করা গেলেও সঠিক পরিমান শনাক্ত করা সম্ভব নয়। হাড়ভাঙার আগেই

সঠিক সময়ে অস্টিওপোরোসিস শনাক্ত করার জন্য বোন মিনারেল ডেনসিটি পরীক্ষাটি করা হয়ে থাকে। সাধারণত কোমর বা মেরুদণ্ড হাড়ের ডেস্ক স্ক্যানের মাধ্যমে হাড়ের ঘনত্ব নিরূপন করা হয় এবং তা থেকে হাড়ভাঙার ঝুঁকি নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণ করা যায়। এ ছাড়া রক্তের কিছু পরীক্ষার মাধ্যমেও (বোন টার্ন ওভার মার্কার) অস্টিওপোরোসিসজনিত হাড়ভাঙার ঝুঁকি মাপা হয়ে থাকে।

বিএমডি অর্থাৎ বোন মিনারেল ডেনসিটি দ্বারা শনাক্তকরণ:
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত BMD এর মাত্রাগুলো জেনে নিতে পারেন-

- স্বাভাবিক ঃ T score -1 SD এর সমান বা উপরে (পজেটিভ)
- অস্টিওপেনিয়া ঃ T score -1 SD থেকে-2.5 SD
- অস্টিওপোরোসিস ঃ T score - 2.5 SD থেকে কম (নেজেটিভ)

এই ছকটি মেনোপজ পরবর্তী মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি ৫.১%। যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৩.১%। মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজ পরবর্তী হরমোনের ইমব্যালেন্স (ইসট্রোজেন, প্রজেস্টরন) এর কারণে অস্টিওপোরসিস এর ঝুঁকি বেশি হয়ে থাকে।

অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ

অন্য অনেক রোগের মতোই চিকিৎসার চেয়ে অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ অনেক সহজসাধ্য। প্রতিরোধের তিনটি ধাপ হলো-

- পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি
- পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম ও
- নিয়মিত ব্যায়াম

অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা

অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো হাড় ভাঙার ঝুঁকি কমানো। জীবনযাত্রায় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত।

- ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন করা।
- নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাসে অভ্যস্থ হওয়া।
- স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করা।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার যেমন- ছোট মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি গ্রহণ করা।

সঠিক জীবনযাত্রার সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট যেমন-***Labcal D*** গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং মেনোপজ-পরবর্তী মহিলাদের ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোসিসজনিত হাঁড়ভাঙা প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের ভূমিকা অপরিসীম। এ ছাড়া এর চিকিৎসায় বিসফসফোনেট, ইবানড্রোনিক এসিড, জোলেনড্রোনিক এসিড জাতীয় ওষুধ ব্যবহৃত হয়, যা শুধু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবনযোগ্য।

ভিটামিন ডি

সূর্যের আলো হচ্ছে ভিটামিন ডি-এর উৎকৃষ্ট উৎস। এ ছাড়া তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুসুমেও কিছু পরিমাণ ভিটামিন ডি রয়েছে। এসব খাদ্যে বেশি কোলেস্টেরল থাকায় এ ধরনের খাদ্য নির্দিষ্ট পরিমানের বেশি গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই ভিটামিন ডি পেতে হলে সূর্য রশ্মিই হচ্ছে প্রধান উৎস।

ক্যালসিয়াম

দৈনিক ক্যালসিয়ামের চাহিদা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম। গড়ে তিন বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন ৫০০ মিলিগ্রাম, চার থেকে আট বছর পর্যন্ত ৮০০ মিলিগ্রাম, নয় থেকে ১৮ বছর বয়সে এক হাজার ৩০০ মিলিগ্রাম, ১৯ থেকে ৫০ বছরে ১০০০ মিলিগ্রাম এবং ৫১ বছর বা তদূর্ধ্বে এক হাজার ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম খাবার থেকে গ্রহণ করা উচিত। দুধ ছাড়াও বাদাম, শাকসবজি, হাঁড়সহ ছোট মাছে প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে।

ব্যায়াম

নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমেও সুস্থ হাড় পাওয়া সম্ভব। ব্যায়াম শুরু করার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। তবে যত তাড়াতাড়ি ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলা যাবে, ততই এর উপকারিতা বেশি। ওজনবাহী ব্যায়াম গুলোই অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধের জন্য বেশি উপযোগী। তবে সুখের বিষয় এই যে অস্টিওপোরোসিস এখন একটি প্রতিরোধ ও নিরাময়যোগ্য রোগ। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক জীবনযাত্রা ও চিকিৎসা।

The columns crack,
when there is a lack...

- European API ensures quality
- Increases Bone Mineral Density (BMD)
- Protection against bone loss
- Meets calcium demand during pregnancy & lactation

Labcal D

Calcium 500 mg & Vitamin D_3 200 IU Tablet

API from Europe

Labaid Pharma *Quality First...*

সুস্থ, সুরক্ষিত থাকতে

বডি কম্পোজিসন অ্যানালাইজার

আজকাল সুস্থ থাকতে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে দেহে জমাকৃত অতিরিক্ত চর্বি। আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের চর্বি জমা হয়ে থাকে। ত্বকের নিচে মেদ জমা ছাড়াও দেহের অভ্যন্তরীণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন-হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও যকৃতের চারপাশেও মেদ জমতে পারে। চর্বি শুধু রোগই তৈরি করে না, দেহের সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দেয়! আমাদের শরীরের গাঠনিক উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ এবং দেহের সামগ্রিক পানির ভারসাম্য পর্যবেক্ষণের জন্য 'বডি কম্পোজিসন অ্যানালাইজার' হলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। দেহের সার্বিক পুষ্টি অবস্থা, সামগ্রিক চর্বির অনুপাত, দেহে পানির সমতা নির্ণয় করাই এর মূল কাজ। এ ছাড়া দেহের সামগ্রিক স্থূলতা নির্ণয়, কোমর ও কোমরের নিচের অংশের মধ্যকার ভারসাম্য, দেহের উপরের ও নীচের অংশের সমতা ও পেশী শক্তি নির্ণয়ের জন্য "বডি কম্পোজিসন অ্যানালাইজার" একটি সহজ নতুন, অত্যাধুনিক ও কার্যকরী পদ্ধতি। এই পরীক্ষাটিতে ব্যক্তির বয়স, উচ্চতা, ওজন ও লিঙ্গ প্রধান নির্ধারক হিসেবে কাজ করে এবং দেহের অন্যান্য উপাদানগুলোর পরিমাপ কি হওয়া উচিত তা নির্ণয় করে।

বডি কম্পোজিসন অ্যানালাইজার এর মাধ্যমে কয়েকটি ভাগে দেহের গাঠনিক উপাদানগুলো সম্পর্কে জানা যায়। যেমন- দেহের প্রাথমিক তথ্য, দেহের গাঠনিক উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ, পেশীর চর্বির বিশ্লেষণ, পানির বিশ্লেষণ, পুষ্টি তথ্য ইত্যাদি। অতিরিক্ত চর্বির কারণে আমাদের দেহের ওজন যখন আদর্শ ওজন অপেক্ষা ১০% বেড়ে যায় তখন আমরা তাকে বলি অতিরিক্ত ওজন আর যখন ২০% বৃদ্ধি পায় তখন আমরা তাকে বলি স্থূলতা। বর্তমানে স্থূলতা নির্ণয়ের জন্য সবচেয়ে নতুন সহজ ও আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে 'বডি কম্পোজিসন অ্যানালাইজার'।

- স্থূলতার কারণে প্রথমেই আমাদের দেহে যে সমস্যাটি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে হাড়ের সমস্যা।
- অতিরিক্ত ওজনের কারণে আমাদের দেহের নিচের অংশকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ওজন বহন করতে হয় ফলে হাড়ের সমস্যা, বাতের সমস্যা লেগেই থাকে।
- একজন স্থূল ব্যক্তির দেহে স্বাভাবিকভাবে খারাপ চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে এবং এর ফলে হৃৎপিন্ডের ধমনীতে এই খারাপ চর্বি জমা হয়ে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে ও হৃদরোগ দেখা দেয়।
- একইভাবে মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল চর্বির কারণে বাধাগ্রস্থ হলে স্ট্রোকের উৎপত্তি ঘটে। উচ্চরক্তচাপের জন্যও অতি চর্বিই দায়ী।
- এ ছাড়া অতিরিক্ত চর্বির কারণে ইনসুলিনের- স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্লুকোজ রক্তেই থেকে যায় এবং দেখা দেয় ডায়াবেটিস।
- বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত চর্বি সন্তান উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করে উর্বরতা কমিয়ে দেয়।
- দেহে জমাকৃত চর্বি প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। স্থূলতা মানেই হচ্ছে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ফলে স্থূল ব্যক্তিদের–
  - স্তন ক্যান্সার
  - জরায়ু ক্যান্সার
  - কোলন ক্যান্সার
  - অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার
  - প্রোস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে

এই সকল জটিলতা খুব সহজেই আমরা দূর করতে পারব, যদি আমাদের জানা থাকে আমাদের দেহের কোথায় কতটুকু চর্বি জমা আছে। দেহের মেদের ভূগোল জানতে আমাদের সহযোগিতা নিতে হবে এই চিকিৎসা প্রযুক্তির। এই পরীক্ষাটির জন্য দেহে কোনো কাঁটা ছেড়া বা ওষুধ প্রয়োগ এর প্রয়োজন নেই। এই পরীক্ষাটির জন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতির ও দরকার হয় না। অসংক্রমিত রোগসমূহ প্রতিরোধের জন্য এই পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। তাই নিজের ও পরিবারের সদস্যদের সুস্থ সবল ও সুরক্ষিত রাখার জন্য ৩ মাস অন্তর এই পরীক্ষাটি অবশ্যই করা উচিত।

জানা অজানার ইবোলা ভাইরাস

অধ্যাপক মোঃ আলী হোসেন
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (চেষ্ট)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও পালমনোলজিষ্ট
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা

ইবোলা হচ্ছে এক ধরনের ভাইরাস যা মানবদেহে ভাইরাসজনিত রোগ সৃষ্টি করে। সাধারণত যে কোন ভাইরাসজনিত রোগের মতো উপসর্গ নিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সমূহে রক্তক্ষরণ এবং ফুসফুস, লিভার ও কিডনি বিকল হতে পারে। সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে মধ্য আফ্রিকায় এ রোগ দেখা যায়। দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ আক্রান্ত হয় বলে এ রোগে মৃত্যুহার (৯০% এর উপরে) অনেক বেশি।

কিভাবে ছড়ায়?

- এ ভাইরাস শিম্পাঞ্জী, বানর, গরিলা, বাদুর, শুকর ইত্যাদির রক্ত ও কোষে থাকে। যারা এ সব প্রাণীর সান্নিধ্যে আসে তাদের রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- আক্রান্ত প্রাণীর অর্ধ খাওয়া ফলমূল অথবা উক্ত প্রাণীর কাঁচা, আধাকাঁচা মাংস ভক্ষণ করলে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত ও শরীর নিঃসৃত রস হতে সরাসরি মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তি যারা নিবিড় সংস্পর্শে আসে তারাও এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।
- চিকিৎসা পেশায় জড়িত জনগোষ্ঠী, তাদের চামড়ার ক্ষতস্থান ও শরীর নিঃসৃত রসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তি ভালো হবার পর ৭ সপ্তাহ পর্যন্ত এ রোগ ছড়াতে পারে বীর্যের মাধ্যমে।

কারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?

- যারা বানর, শুকর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বাদুর লালন পালন করে
- চিকিৎসা পেশায় জড়িত জনগোষ্ঠী
- অনিরাপদ যৌন সংস্পর্শ অথবা রক্ত বা শরীর নিঃসৃত রসের সরাসরি সংস্পর্শকারী
- যারা এই ভাইরাস উপদ্রব এলাকায় ঘনঘন ভ্রমণ করে
- যারা অন্য রোগ (ফুসফুসের রোগ, ডায়াবেটিস, এইডস, কিডনি ও লিভার ফেইলর) আক্রান্ত থাকে।
- যে কোন কারণে যদি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

উপসর্গ কি কি?

জীবাণু আক্রমণ করার ২-২১ দিন পর্যন্ত এ রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে:

- জ্বর (সাধারণত: ১০২° ফা. এর উপরে)
- মাথাব্যথা, গলাব্যথা, গিটেব্যথা
- মাংস পেশী ব্যথা
- খাদ্যে অরুচি
- অতিরিক্ত দুর্বলতা

এসব উপসর্গ নিয়ে আসতে পারে, পরবর্তীতে

- বমি
- পাতলা পায়খানা
- চামড়ার নিচে লাল লাল দাগ (রক্ত ক্ষরণ)
- অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট
- কিডনি ও লিভার ফেইলর পর্যন্ত হতে পারে

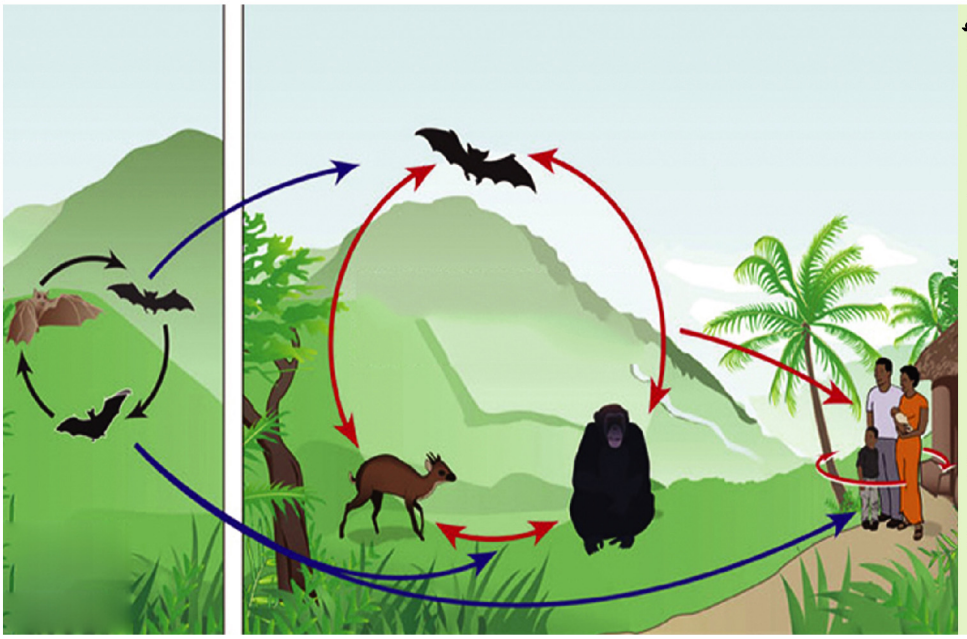

চিকিৎসা

- এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই
- নিশ্চিত প্রতিরোধক কোন ভ্যাকসিন ও নেই
- উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করা ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহকে রক্ষা করাই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য
- আক্রান্তব্যক্তিকে দ্রুত সবার থেকে আলাদা করতে হবে
- প্রয়োজনে আলাদা ওয়ার্ড ও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র তৈরি করে চিকিৎসা দিতে হবে।
- রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে রক্ত ও রক্তের বিভিন্ন উপাদান দিতে হবে
- পানিশূণ্যতা ও লবণ ঘাটতির জন্য পর্যাপ্ত তরল খাবার এবং প্রয়োজনে স্যালাইন দিতে হবে।

- অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহে রক্তক্ষরণ থেকে আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কিভাবে সনাক্ত করা যায়?

ক) সঠিকভাবে রোগের বিবরণ, রোগীর ভ্রমণ ইতিহাস, আক্রান্ত প্রাণী/রোগীর সংস্পর্শে আসা অথবা অনিরাপদ রক্ত বা যৌন সংস্পর্শ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা।

খ) একই ধরনের উপসর্গ তৈরি করে এ ধরণের রোগকে আলাদা করা যেমন: ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, সিগেলোসিস, প্লেগ, রিকেটসিয়াল ফিভার, মেনিনজাইটিস, হেপাটাইটিস ইত্যাদি।

গ) ল্যাবরেটরী পরীক্ষা

১. পূর্ণাঙ্গ রক্ত পরীক্ষা-
   - শ্বেতরক্ত কণিকা কম থাকে।
   - অনুচক্রিকা কমে যায়।
২. লিভার এনজাইম- বেড়ে যায়।
৩. সিমেন এনালাইসিস ও ভাইরাস সেল কালচার।
৪. এলিজা টেস্ট।
৫. এন্টিজেন ডিটেকসন টেস্ট।
৬. পিসিআর।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

ক) যেহেতু এ রোগে মৃত্যুহার অনেক বেশি (৯০% এর উপরে) সেজন্য সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাবধানতা অবলম্বন করাই এ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়।

খ) যারা বিভিন্ন ফার্মে শুকর/বানর পালন করে তাদেরকে এ রোগ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান দান করতে হবে। প্রয়োজনে ফার্মকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বা অন্য কোন ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে নির্দিষ্ট সময় পর পর।

গ) আক্রান্ত প্রাণীকে খুব দ্রুত আলাদা করতে হবে, প্রয়োজনে মেরে মাটি চাপা দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ঘ) এক জায়গা হতে অন্যত্র আক্রান্ত প্রাণীদের বিচরণ বন্ধ করতে হবে।

ঙ) আক্রান্ত প্রাণীর অর্ধ খাওয়া ফলমূল পরিহার করতে হবে।

চ) যে সব প্রাণী এ ভাইরাস ছড়ায় সে সব প্রাণীর মাংস পরিহার করতে হবে অথবা ভালোভাবে সিদ্ধ করে খেতে হবে।

ছ) চিকিৎসা সেবায় জড়িত জনগোষ্ঠীকে ব্যক্তিগত সাবধানতা নিতে হবে। যেমন– হ্যান্ডগ্লোভস, ফেসমাস্ক অথবা বিশেষ ধারণের গাউন পরিধান করতে হবে।

জ) রোগীর কাছ হতে ফিরে ভালোভাবে হাত মুখ পরিস্কার করতে হবে।

ঝ) বিভিন্ন মিডিয়াকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঞ) বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের সঠিকভাবে এ রোগ নিরূপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

মারাত্মক এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে সঠিক সময়ে রোগ নিরূপন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। সরকারি ও বেসরকারি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

ফিমেল ইউরোলজি

নারীর মূত্রতন্ত্রের বিশেষ রোগ

ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
এফআরসিএস (গ্লাসগো, ইউকে), এফসিপিএস, এমবিবিএস
ইউরোলজিস্ট ও ইউরো অনকোলজিস্ট
কিডনি, মূত্রনালী ও পুংজননতন্ত্র বিশেষজ্ঞ সার্জন
চীফ কনসালটেন্ট এবং বিভাগীয় প্রধান, ইউরোলজি
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল।

একজন মহিলা, পুরুষের মতই অন্যান্য ইউরোলজি রোগে ভুগতে পারেন। যেগুলোর মধ্যে আছে কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের ক্যান্সার, কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের পাথুরে রোগ, আঘাতজনিত সমস্যা ইত্যাদি। তবে নারী পুরুষের দৈহিক গড়ন ও প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে নারীর মূত্রতন্ত্রের বা ইউরোলজি রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন, মূত্রথলির অস্থিরতা, মূত্রঝরা, ফিস্টুলা ও স্ট্রিকচার।

মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন

মহিলাদের ঘনঘন ইউটিআই বিশ্বব্যাপি একটি প্রচলিত সমস্যা। মহিলাদের মূত্রপথের কম দৈর্ঘ্য, মূত্রদ্বার ও যোনি পথের নিকট অবস্থান, মেনোপোজের পর মূত্রপথের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মহিলাদের মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন হয়ে থাকে। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এর প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এ ছাড়া গর্ভবতী অবস্থায়ও নানাবিধ কারণে মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনের প্রবণতা অনেকগুন বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস, বাতজনিত রোগ ও বার্ধক্যজনিত কারণে মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন হয়ে থাকে। এদের মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনে ঘনঘন এ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হয়। অন্য সাধারণ অসুখের মত স্বল্প সময়ের জন্য (অর্থাৎ ৫-৭ দিন) এ্যান্টিবায়োটিক খেলেই ইউটিআই সবসময় ভাল হয় না। অনেক সময় দীর্ঘদিন এ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়।

তবে যাদের ঘনঘন ইউটিআই হয় তাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা জরুরি। ইউটিআই-এর ক্ষেত্রে শতকরা ৮৫ ভাগ জীবাণু ই-কোলাই পাওয়া যায়। অন্যান্য জীবাণুর মধ্যে আছে ক্লেবসিলা এন্টারোব্যাকটেরিয়াসি, প্রটিয়াস ইত্যাদি। তবে বিশেষক্ষেত্রে সিউডোমনাস পাওয়া যেতে পারে। এ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পূর্বে মূত্রের কালচার সেনসিটিভিটি করা হয় যাতে সঠিক এ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া মূত্রতন্ত্রের আর কোন জটিলতা আছে কিনা ক্ষেত্র বিশেষে আলট্রাসাউন্ড অথবা এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখে নেয়ার দরকার হয়। যেমন- মূত্রত্যাগের পর প্রস্রাবের থলিতে মূত্র থেকে যায় কিনা, মূত্রতন্ত্রে পাথর আছে কিনা, কিডনির কোন অংশ অস্বাভাবিক ফোলা কিনা অথবা প্রস্রাব উল্টোদিকে প্রবাহ হয় কিনা। যাদের এ ধরনের সমস্যা থাকে, প্রাথমিকভাবে এগুলোর চিকিৎসা না করলে ইউটিআই ভালো হয় না।

মূত্রথলির অস্থিরতা

ঘনঘন মূত্রত্যাগ, তাড়াহুড়া করে মূত্র ত্যাগের প্রবণতা, টয়লেটে পৌঁছাবার পূর্বেই মূত্রত্যাগের নিয়ন্ত্রণ হারানো, বাড়িতে পৌঁছা মাত্রই অথবা পানির সংস্পর্শে আসা মাত্রই মূত্রত্যাগের বেগ পাওয়া। সব সময় তলপেটে অস্বস্থি অনুভূত হওয়াকে মূত্রথলির অস্থিরতা বা ওভারএ্যাকটিভ ব্লাডার বলা হয়ে থাকে।

নানাবিধ কারণে যদিও এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- স্নায়ুবিক জটিলতা, স্ট্রোক, স্ট্রিকচার ইত্যাদি রোগে মূত্রথলির অস্থিরতা দেখা যায়। তবে কোন কারণ ছাড়াও মূত্রথলির এই অস্থিরতা দেখা দিতে পারে যাকে আমরা ইডিওপ্যাথিক ডেট্রসর ইনস্টিবিলিটি বলে থাকি। এই সমস্যা তরুণীদের ক্ষেত্রে বেশি হলেও যে কোন বয়সেই দেখা দিতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার মাধ্যমে মূত্রথলির অস্থিরতার অন্য কারণগুলো বাদ দেওয়ার পরই কেবল এটা বলা যায়। সবশেষে ইউরোডায়নামিক পরীক্ষা (সিস্টোমেট্রি) করেই এটা

মূত্রঝরাঃ বিভিন্নভাবে মূত্রঝরা দেখা দিতে পারে

স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্সঃ এ অবস্থায় হাঁচিকাঁশির সঙ্গে মূত্র নির্গত হয়ে থাকে। বার্ধক্য বা প্রসবজনিত কারণে পেলভিক ফ্লোরের মাংস দুর্বল হয়ে মূত্রদ্বারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে এটি হয়ে থাকে। ব্যায়ামের মাধ্যমে এ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয়।

আর্জ ইনকন্টিনেন্সঃ এ অবস্থায় হঠাৎ মূত্রত্যাগের বেগ পেয়ে টয়লেটে পৌঁছানোর পূর্বেই মূত্র নির্গত হয়ে থাকে। ওভারএকটিভ ব্লাডার অথবা স্নায়ুবিক জটিলতা থেকে এটি হতে পারে। যদিও ওষুধ সেবনে অধিকাংশ রোগী ভাল থাকে তবে ক্ষেত্র বিশেষে অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয়।

কন্টিনিয়াস ইনকন্টিনেন্স (সবসময় মূত্রঝরা)ঃ মূত্রদ্বারের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেলে, মূত্রথলির সঙ্গে জননতন্ত্রের অস্বাভাবিক যোগাযোগে তৈরি ফিস্টুলা থাকলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এখানে সাধারণত ওষুধে কাজ হয় না। রোগী ফিট থাকলে অস্ত্রপচারের মাধ্যমেই এটি থেকে আরোগ্য পাওয়া যায়। নিচে ফিস্টুলা নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা করা হল।

নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা যায়। মূত্রথলির অল্প ও মধ্যম মাত্রার অস্থিরতা সাধারণত ওষুধ সেবনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। তবে অধিক মাত্রার অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয় এবং রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা যায়।

জেনিটো ইউরিনারী ফিস্টুলা

ফিস্টুলা-মূত্রতন্ত্রের সঙ্গে জননতন্ত্রের অস্বাভাবিক যোগাযোগের ফলে এটি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন কারণে এটি সৃষ্টি হতে পারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জন্মগতভাবে, অপারেশনের জটিলতা থেকে, প্রসব জটিলতা থেকে। আমাদের দেশের একটি বড় কারণ হচ্ছে প্রসবজনিত জটিলতা। এদেশে গর্ভবতী নারীদের সেবা এখনো পর্যাপ্ত না হওয়ায় এখনও অনেক পরিমান দেখা যায় এই সমস্যাটি। এ ধরনের অবস্থা যে কোন নারীর জন্য একটি চরম অবস্থা। এরা সামাজিক ভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বামী পরিত্যাক্তা হন। অস্ত্রপচারের মাধ্যমে এ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়।

পরিশেষে, এ কথা বলা প্রয়োজন যে উপরে উল্লেখিত ইউরোলজীক্যাল সমস্যাগুলি কোনভাবেই কিডনি বা স্ত্রী রোগ নয়। অনেকে এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ভুল চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। আবার অনেকেই একে দূরারোগ্য ব্যাধি ভেবে চিকিৎসা না নিয়েই অহেতুক কষ্ট পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশেই এখন এ ধরণের রোগের উন্নত চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

FibroScan

[HOTLINE : 10606]

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি

আপনার লিভারের অবস্থা জানতে

ফাইব্রোস্ক্যান

লিভার দেহের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। যা একদিকে রক্তকে পরিশোধিত করে এবং অন্যদিকে দেহের অত্যাবশ্যকীয় নানা উপাদান তৈরি ও মজুদ করে। আর লিভারের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো ব্যাহত হয়, যদি লিভার রোগাক্রান্ত হয়।

ফাইব্রোস্ক্যান কেন করবেন?

- বার বার জন্ডিসে আক্রান্ত হলে
- ফ্যাটি লিভার
- প্রাথমিক বিলিয়ারি সিরোসিস
- লিভারের রুটিন পরীক্ষা হিসাবে
- হেপাটাইটিস বি অথবা সি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে
- এ্যালকোহলিক রোগীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়
- অটোইমিউন হেপাটাইটিস
- এছাড়াও লিভারের বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী রোগ হলে

ফাইব্রোস্ক্যান পরীক্ষাটি ল্যাবএইড-এর সকল শাখাসমূহে করা হয়:

- ধানমন্ডি: বাড়ি ৬, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, মোবাইল : ০১৭ ৬৬৬৬ ০১৯৮
- গুলশান: বাড়ি ১৩/এ, রোড ৩৫, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, মোবাইল : ০১৭ ৬৬৬৬ ২৫২৫
- উত্তরা: বাড়ি ১৫, রোড ১২, সেক্টর ৬, উত্তরা, ঢাকা, মোবাইল : ০১৭ ৬৬৬৬ ২৬০৬
- মিরপুর: প্লট ৯, সেকশন ১, ব্লক-বি, মিরপুর ১, ঢাকা ১২১৬, মোবাইল : ০১৭ ৬৬৬৬ ২৮৮৮
- চট্টগ্রাম: ফোরাম সেন্ট্রাল, গোলপাহাড় মোড়, মোবাইল : ০১৭ ৬৬৬৬ ২৮২৯

বয়সভেদে নারীর খাদ্যপুষ্টি

সালমা পারভীন
পুষ্টিবিদ
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল

মেয়েদের জীবনের বিভিন্ন ধাপ যেমন-গর্ভাবস্থা, বয়:সন্ধীক্ষণ, মেনোপোজে শরীরকে ঠিক রাখতে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। দীর্ঘদিন সুস্থ ও নিরোগ থাকতে কিছু খাবার অবশ্যই খেতে হবে এবং কিছু খাবার ছেটে ফেলে দিতে হবে খাদ্য তালিকা থেকে।

বিভিন্ন ধাপে মহিলাদের পুষ্টি

নারীদের জীবনে গর্ভধারণ ও সন্তান পালন খুবই স্বাভাবিক ধাপ। তাই এই ধাপে তাদের পুষ্টি চাহিদায় কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে।

একটি সুস্থ গর্ভাবস্থার জন্য পুষ্টি

১) ফ্যাট এবং প্রোটিন শিশুর মস্তিস্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছ, মুরগি, ডিম, বাচ্চা গরুর মাংস, প্রোটিন জাতীয় খাবারের ভালো উৎস।

২) ফ্যাটের জন্য সয়াবিন অথবা সানফ্লাওয়ার তেল রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন।

৩) একবারে বেশি না খেয়ে অল্প করে বার বার খেতে হবে।

৪) প্রচুর পরিমানে শাক সবজি, রঙিন ফল প্রতিদিন খেতে হবে।

৫) প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে।

৬) দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য যেমন- দই, পুডিং, পায়েস এ ধরনের খাবার খাওয়া ভালো।

প্রসূতি মায়ের পুষ্টি

স্তন দানের সময় মায়েদের ক্যালরি, প্রোটিন, মিনারেল ও ভিটামিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

১) মাছ, মুরগি, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাবারের ভাল উৎস।

২) সবুজ ও রঙিন সবজি যেমন- গাজর, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, চালকুমড়া ও মৌসুমী সবজি ও ফল ভিটামিনের চাহিদা পূরণের জন্য বেশি করে খেতে হবে।

৩) দুধ, দই, পনির ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

৪) প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল খাবার, ফলের রস খেতে হবে।

গর্ভাবস্থা ও প্রসূতী মায়েদের জন্য যে সব খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না– কফি, চা, কোমল পানি, বেশি চর্বিযুক্ত মাছ, মাংস, মগজ ইত্যাদি, চিনি ও অধিক মিষ্টি যুক্ত খাবার, সিগারেট, অ্যালকোহল, তামাক, অধিক মশলা যুক্ত, তৈলাক্ত ও ঝাল খাবার, ঘি, মাখন, নারিকেল ইত্যাদি।

মেনোপোজ (Menopouse) পুষ্টি

মেয়েদের জীবনের আরো একটি বিশেষ ধাপ হলো মেনোপোজ। সাধারণত আমাদের দেশে ৪৫-৫৫ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের মেনোপোজ হয়ে থাকে। এই সময় তাদের খাদ্যাভাসের কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমেও তারা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক জটিলতা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

১) **ক্যালসিয়াম গ্রহণ:** প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে হাড়ের ক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তাই ডিমের সাদা অংশ, মাছ, মুরগীর মাংস ও ননীবিহীন দুধ ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে।

২) ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ এই দুটি ফ্যাটি এসিড আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এডিস, সামুদ্রিক মাছ যার ভাল উৎস। এই ফ্যাটি এসিড মেনোপোজের সময় শক্তি এবং হরমোনের পরিমান ঠিক রাখতে সাহায্য করে থাকে।

নিত্য দিনের খাদ্য

১) প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সবুজ শাক-সবজি, ফল, মটরশুটি এবং ডাল রাখা প্রয়োজন। লাল চাল ও আটা সারাদিন শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে বলে এই খাবারগুলো খাদ্যের প্রধান অবলম্বন করতে হবে।

২) অষ্টিওপরোসিস রোগ এড়াতে ক্যালসিয়াম অতি গুরুত্বপূর্ণ। ডিমের সাদা অংশ, মাছ ও মুরগির মাংস, ননী বিহীন দুধ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, করল্লা, ব্রকলি ডাল ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের ভাল উৎস। নিয়ম করে খান।

৩) প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য শরীর থেকে ক্যালসিয়াম বের করে দেয় বলে পরিমিত পরিমানের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

৪) আমাদের দেশের মেয়েরা আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতায় ভুগে থাকে। বাচ্চা গরুর মাংস, মাছ, মুরগি, কলিজা, ডাল, রঙিন শাক সবজি, ফল, লাল চাল ও আটা ইত্যাদি খেলে রক্তস্বল্পতা দূর হবে।

স্তন ক্যান্সার

নির্ণয় ও করণীয়

ডাঃ হ্যাপী হোসেন

এমবিবিএস, এমফিল (ক্লিনিক্যাল অনকোলজি)

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ক্যান্সার বিভাগ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও স্তন ক্যান্সার মেয়েদের জন্য দু:সহ একটি ব্যাধি। এজন্য স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা দরকার। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে স্তন ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব। সাধারণত স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়ের রোগীর শতকরা ৮৫-৯৮ ভাগ ৫ বছর বেঁচে থাকেন। শেষ পর্যায় বা চতুর্থ পর্যায়ের রোগীর শতকরা ১০ ভাগ ৫ বছর বেঁচে থাকেন। দশ বছরে চতুর্থ পর্যায়ের রোগীর ২% বেঁচে থাকেন। বিভিন্ন দেশের হিসেবে এই সংখ্যার তারতম্য হয়। গড়পড়তায় সংখ্যাগুলো কাছাকাছি। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, স্তন ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা কতটা জরুরি। আমেরিকার ৪০তম প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের স্ত্রী ন্যান্সি রিগ্যানের বাম স্তনে ক্যান্সার ধরা পড়ে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে। ৯২ বয়সের ন্যান্সি আজো বেঁচে আছেন ক্যান্সার জয় করে। এ রকম উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে।

নিজেই যখন চিকিৎসক

ছবিতে যে পদ্ধতি দেয়া আছে তা ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হল:

ধাপ ১: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুই বাহু শরীরের দুপাশে লম্বা হয়ে ঝুলবে।

ধাপ ২: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুই বাহু একত্রে মাথার পিছনে নিতে হবে।

ধাপ ৩: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুই কোমরে ধরতে হবে।

দেখতে হবে কোন অস্বাভাবিক পিন্ড চোখে পড়ে কিনা। কোন জায়গায় চামড়া কুঁচকে গিয়েছে কিনা। কোথাও টোল আছে কিনা।

ধাপ ৪: হাতের আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে চেপে কোন পিন্ড আছে কিনা অনুভব করতে হবে।

ধাপ ৫: হাতের আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে চাপ দিলে স্তন বৃন্ত (নিপল) থেকে কোন রস বের হয় কিনা দেখতে হবে।

ধাপ ৬: শুয়ে হাতের আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে চেপে কোন পিন্ড আছে কিনা অনুভব করতে হবে।

নিজে স্তন পরীক্ষা তাত্ত্বিকভাবে নিখুঁত হলেও গবেষণার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা প্রমানিত হয়নি। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আমেরিকার জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, আমেরিকার রোগ প্রতিরোধ টাস্ক ফোর্সসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজে স্তন পরীক্ষা প্রচারের বিরোধী।

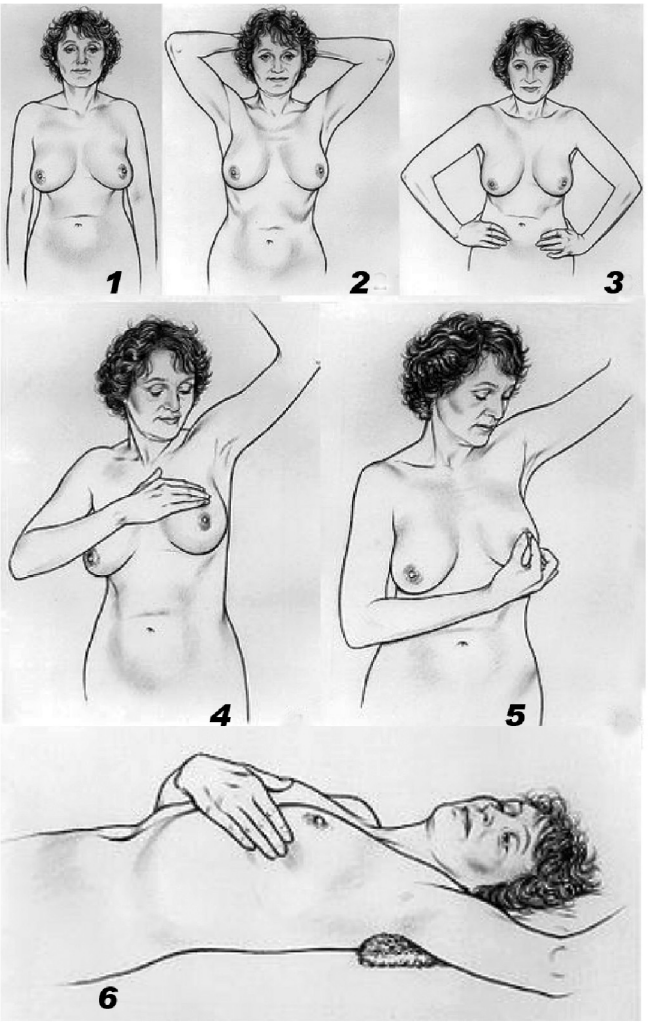

স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো জেনে নেয়া যাক :

- বেশি ঝুঁকি
- মাঝারি ঝুঁকি
- কম ঝুঁকি

বেশি ঝুঁকি

- সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন মহিলারা (মাত্র ১% পুরুষ স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন)
- যাদের বয়স ৫০ এর ওপর
- জিনগত ত্রুটি (বি আর সি এ ১ ও বি আর সি এ ২)
- মা অথবা বোনের যদি স্তন ক্যান্সার হয়ে থাকে।
- যদি আগে স্তনে কোন অসুখ হয়ে থাকে (যেমন টিউমার)।

এদের ঝুঁকি সাধারণ মহিলাদের তুলনায় চার গুণ বেশি। যেকোন একটির উপস্থিতিকে বেশি ঝুঁকি বলা যাবে না। একাধিক ফ্যাক্টরের উপস্থিতি থাকতে হবে।

মাঝারি ঝুঁকি

- মা অথবা বোনের যদি স্তন ক্যান্সার হয়ে থাকে
- উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত
- মাসিক যদি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে (যেমন, বাচ্চা না হলে, বেশি বয়সে প্রথম বাচ্চা নিলে)
- মেনোপজ পরবর্তী স্থূলতা
- যদি আগে কখনো ওভারি বা এন্ডোমেট্রিয়ামে ক্যান্সার হয়ে থাকে
- কিছু স্তন রোগ (এটিপিক্যাল প্রোলিফারেটিভ বিনাইন ডিজিজ)
- যদি বুকে উচ্চ মাত্রায় রেডিয়েশন দেয়া হয়

এদের ঝুঁকি সাধারণ মহিলাদের তুলনায় দুই থেকে চার গুণ বেশি

কম ঝুঁকি

- মাঝারি পরিমানে অ্যালকোহল সেবন
- মাসিক যদি ১২ বছরের আগে শুরু হয়
- মাসিক যদি ৫৫ বছরের পরে শেষ হয়
- কোন সন্তান নেই
- সন্তান স্তন পান করেনি
- হরমোন রিপ্লেসমেন্ট চিকিৎসা নিয়েছেন
- অতি সম্প্রতি জন্মরোধক বড়ি সেবন শুরু করেছেন

এদের ঝুঁকি সাধারণ মহিলাদের তুলনায় এক থেকে দুই গুণ বেশি।

স্তন ক্যান্সার এড়াতে করণীয়

যাদের বয়স ৪০ বা তার চেয়ে বেশি:

- বছরে একবার ম্যামোগ্রাফি (স্তনের এক্সরে)
- বছরে একবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে স্তন পরীক্ষা করানো
- মাসে একবার নিজে স্তন পরীক্ষা (বাধ্যতামূলক নয়)

যাদের বয়স ২০-৩৯ বছর:

- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে স্তন পরীক্ষা করানো, প্রতি তিন বছরে একবার
- মাসে একবার নিজে স্তন পরীক্ষা (বাধ্যতামূলক নয়)
- স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি নিজে নির্ণয় করা কঠিন। বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকের মাধ্যমে ঝুঁকি নির্ণয় করা উচিত

যাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি আছে তাদের জন্য পরামর্শ

১। চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। শাকসবজি ও ফল প্রতিদিন খেতে হবে।

২। প্রতিদিন এক ঘণ্টা হাঁটতে হবে।

৩। ত্রিশ বছরের আগে প্রথম সন্তান নিতে হবে।

৪। সন্তানকে স্তন পান করাতে হবে।

৫। জন্ম নিয়ন্ত্রন বড়ি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে শুরু করতে হবে। যারা নিয়মিত খাচ্ছেন, তারা পরামর্শ করে জেনে নিবেন, আপনার বড়িতে ঝুঁকি কতটুকু।

৬। যদি কারো মদ্যপানের অভ্যাস থাকে, সেটি পরিহার করতে হবে।

৭। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি শুরুর আগে বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকের সাথে আলাপ করতে হবে।

স্ক্রিনিং

স্ক্রিনিং পদ্ধতিতে যাদের ঝুঁকি রয়েছে কিন্তু আপাতভাবে সুস্থ মনে হয়, তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করার জন্য কিছু পরীক্ষা করা হয়।

স্ক্রিনিং এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

১। নিজে স্তন পরীক্ষা

২। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে স্তন পরীক্ষা করানো।

৩। ম্যামোগ্রাফি।

নির্দিষ্ট একজন মেয়ের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং শুরু করার ঠিক বয়স কত?

গাইড লাইন অনুযায়ী, পরিবারে যে বয়সে স্তন ক্যান্সার হয়েছিল তার ৫-১০ বছর পূর্ব থেকে স্ক্রিনিং শুরু করতে হবে। যেমন- কোন পরিবারে মায়ের ৪০ বছর বয়সে স্তন ক্যান্সার হলে মেয়ে ৩০ বছর বয়স থেকে স্ক্রিনিং শুরু করতে পারেন। স্ক্রিনিং করে আপাত সুস্থ নারীদের প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন ক্যান্সার সনাক্ত করা সম্ভব। তখন চিকিৎসা করলে সবচেয়ে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এঞ্জেলিনা জোলি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে অপারেশনের মাধ্যমে স্তন অপসারণ করেন। ২৭ এপ্রিল ২০১৩ সালে চিকিৎসকরা আরেকটি অপারেশনের মাধ্যমে কৃত্রিম স্তন তৈরি করে দেন। সাধারণত মেয়েদের বাম স্তনে ক্যান্সার বেশি হয়। এর কারণ ঠিকমতো জানা যায়নি। জোলি দুই স্তনই অপসারণ করেন। জোলির ৮৭% ঝুঁকি ছিল স্তন ক্যান্সার হবার। তার ত্রুটিপূর্ণ বি আর সি এ ১ জিন আছে। জোলির মা বিখ্যাত টিভি অভিনেত্রি মার্সে বারট্রান্ড (ফরাসি বংশোদ্ভুত) ১৯৯৯ সালে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। পরবর্তীতে হয় ওভারিয়ান ক্যান্সার। আট বছর যুদ্ধ করার পর ৫৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। জোলির খালার স্তন ক্যান্সার হয়েছিল। অপারেশনের পর জোলির স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি এখন শতকরা ৫ ভাগের কম। বি আর সি এ ১ জিনের কারণে তার ৫০% সম্ভাবনা আছে ওভারিয়ান ক্যান্সার হবার। জোলির পরিকল্পনা আছে ওভারি অপসারণ করার। আমরা আশা করি ক্যান্সার প্রতিরোধের যুদ্ধে এঞ্জেলিনা জোলি জয়ী হবেন।

ডার্মাটোলজি, লেজারথেরাপি ও কসমেটোলজি বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডাঃ জিনাত মেরাজা (স্বপ্না)

এমবিবিএস (ডিএমসি), এমসিপিএস, ডিডি (থাইল্যান্ড), এফসিপিএস এফআরসিপি (গ্লাসগো)
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (এক্স)
সিনিয়র কনসালটেন্ট, ডার্মাটোলজি
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : শনি, রবি, সোম : সকাল ১০টা - সন্ধ্যা ৭টা ও মঙ্গলবার: সকাল ১০টা - দুপুর ২টা

ইউরোলজি বিশেষজ্ঞ

ডাঃ মুহাম্মদ হোসেন

এমবিবিএস, এমএস (ইউরোলজি)
ইউরোলজিস্ট এন্ড এ্যান্ড্রোলজিস্ট,
সহযোগী অধ্যাপক, ইউরোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : বিকাল ৫টা- রাত ৯টা (শুক্রবার বন্ধ)

মেডিসিন, ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ ওয়াসিম মোঃ মহসিনউল হক

এফসিপিএস (মেডিসিন)
সহযোগী অধ্যাপক, নেফ্রোলজি বিভাগ
বারডেম হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড
সময় : বিকাল ৬টা - রাত ৯টা (বৃহস্পতি, শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন বন্ধ)

শিশু ও শিশু কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সৈয়দ সাইমুল হক

এমবিবিএস, এমডি, ক্লিনিক্যাল ফেলো (শিশু কিডনি রোগ)
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল, সিঙ্গাপুর
সহকারী অধ্যাপক, শিশু কিডনি রোগ বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড (এনেক্স)
সময় : সন্ধ্যা ৬টা-রাত ৯টা (বৃহস্পতি ও শুক্রবার বন্ধ)

ক্লিনিক্যাল এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

ডাঃ অরুন কুমার শর্মা

এমবিবিএস, এমসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (কার্ডিওলজি), এফএসিসি (ইউএসএ)
ক্লিনিক্যাল এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
সিনিয়র কনসালটেন্ট ও ইনচার্জ (সিসিইউ-২)
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ঢাকা

শিশু মেডিসিন ও শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার

এমবিবিএস (ঢাকা), এমডি (শিশু)
স্কট হার্ট ইনস্টিটিউট, দিল্লী-এ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, শিশু কার্ডিওলজি বিভাগ,
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড (এনেক্স)
সময় : বিকাল ৫টা-রাত ৮.৩০ (শুক্রবার বন্ধ)

অর্থোপেডিক ও স্পাইন সার্জন

ডাঃ এরফানুল হক সিদ্দিকী

এমবিবিএস (ডিএমসি), এমএস (অর্থো), এফআরএসএইচ (লন্ডন)
ট্রমা, হাড় জোড়া, বাত ব্যথা, ঘাড়, কোমর, হাঁটু ব্যথা ও স্পাইন বিশেষজ্ঞ
অর্থোপেডিক ও স্পাইন সার্জন, বিএসএমএমইউ (পিজি হাসপাতাল)
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড (এনেক্স)
সময় : প্রতিদিন বিকাল ৩.৩০টা - রাত ৯টা

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ

ডাঃ ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ
এমবিবিএস (ডিএমসি) এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি-বারডেম)
মেডিসিন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোনরোগ বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক (ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইনোলজি)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস

গর্ভাবস্থায় যখন শরীর যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না তখনই গর্ভকালীন ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এই ইনসুলিন এর অভাবে রক্তে চিনির পরিমাণ (ব্লাড সুগার) স্বাভাবিক মাত্রা থেকে বাড়তে থাকে। বর্তমানে প্রায় শতকরা ২-১০ ভাগ গর্ভবতীর এই ধরনের ডায়াবেটিস দেখা দেয়।

দ্রুতগতিতে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সনাক্ত করে এবং চিকিৎসা করে সন্তানের জটিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিয়ে আনা যায়। সন্তান প্রসবের পরে যেহেতু ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস আবারও দেখা দিতে পারে তাই মায়ের নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্লাড সুগার পরীক্ষা করতে হয়।

কাদের, কখন, কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে

সকল গর্ভবতীরই ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষার সময় এই পরীক্ষা সাধারণত গর্ভের ২৪ থেকে ২৮ সপ্তাহে কাজ হয়। তবে যাদের নিম্ন লিখিত ঝুঁকি থাকে তাদের আরও আগে পরীক্ষা করা উচিত।

যেমন–

১) পূর্ববর্তী গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস।

২) স্থূলতা।

৩) পরিবারে কারো ডায়াবেটিস।

বিভিন্নভাবে পরীক্ষাটি করা যায় তবে সহজ ও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ খালি পেটে (৮-১৪ ঘণ্টা না খেয়ে) এবং এরপর ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে ১ ঘণ্টা ও ২ ঘণ্টা পর। যদি এই ৩ বারের মধ্যে এক বা ততোধিক বার রক্তের সুগার নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হয় তবে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস আছে বলা যায়।

চিকিৎসা

১। খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ও নিয়মিত হাঁটাহাঁটি

- চিনি, মিষ্টি, কোমল পানীয়, আইসক্রিম, মিষ্টি বিস্কুট ও কেক পরিহার করা
- চিনির বদলে এসপারটেম, সুক্রালোজ জাতীয় বড়ি বা পাউডার ব্যবহার করা যাবে
- প্রচুর শাক-সবজিও নিয়মিত ফল ও দুধ খেতে হবে
- মাছ ও মাংস নির্দিষ্ট পরিমাণ, তবে হাঁস বা মুরগীর চামড়া খাওয়া যাবে না
- মোট খাবারের পরিমাণ (শক্তি বা ক্যালরী) সাধারণ নারীর তুলনায় গর্ভবতীর কিছুটা বেশি প্রয়োজন হয়
- এই ব্যাপারে একজন পুষ্টিবিদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে

২। গর্ভাবস্থায় দৈনিক ৪ বার ব্লাড সুগার পরিমাপ করা উচিৎ (বাসায়, গ্লুকোমিটারের সাহায্যে) নাস্তার আগে এবং প্রতিবার খাবারের ২ ঘণ্টা পর। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এটা ঠিক করতে হবে।

৩। ইনসুলিন গ্রহণ।

নারী ও অন্যান্য হরমোন রোগ

১। থাইরয়েড

আমাদের গলার সামনের অংশে থাইরয়েড নামক এক ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন গ্রন্থি থাকে। নারীদের থাইরয়েডের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা পুরুষের থেকে প্রায় দশগুণ বেশি।

গুরুত্ব

থাইরয়েড সমস্যা নারীর কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে, অনিয়মিত হাইপোথাইরয়েড অবস্থায় সন্তান ধারণ করলে বাচ্চা হাবা গোবা হওয়াসহ আরও অনেক জটিলতা হতে পারে।

২। পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম সমূহ

৫-১০ শতাংশ নারীর এই রোগ দেখা যায় যা পুরুষ হরমোনের আধিক্যের কারণে হয়ে থাকে।

লক্ষণসমূহ

- মুখে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে লোম আসা
- মাথার চুল কমে যাওয়া
- মুখে ব্রণ দেখা দেয়া
- অনিয়মিত মাসিক এবং ঘাড় বগল কালো হওয়া
- মোটা হয়ে যাওয়া
- ডায়াবেটিস দেখা দেওয়া
- সন্তান ধারণে অক্ষমতা

চিকিৎসা

- নিয়মিত হাঁটাহাটি ও খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে ওজন কমানো
- হরমোন সমস্যা কমানোর জন্য ওষুধ নিয়মিত সেবন

হাইপার প্রোলাকটিনেইমিয়া

প্রোলাকটিন এক ধরনের হরমোন যা আমাদের মাথার ভিতরে পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে নি:সরণ হয়। এই হরমোন নারী স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। হরমোনের পরিমাণ বেশি হলে-

ক) অবিবাহিত নারীর স্তন থেকে দুধ নিঃসরিত হতে পারে

খ) মাসিক অনিয়মিত

গ) সন্তান ধারণে অক্ষমতা

ঘ) মাথাব্যথা হতে পারে

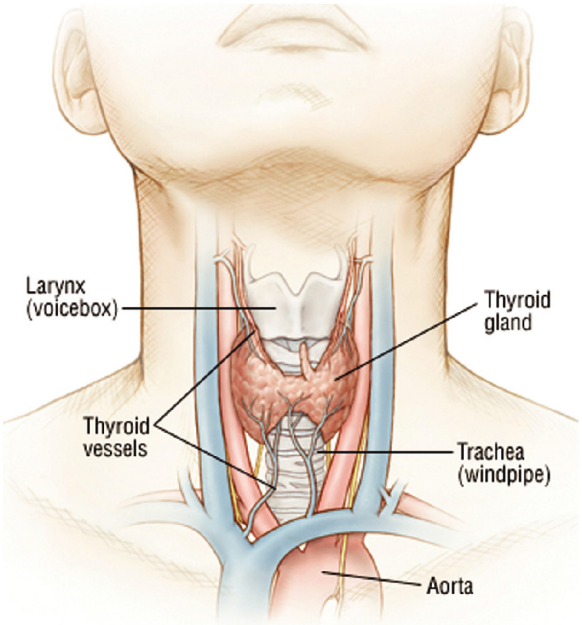

চিকিৎসা

ওষুধ সেবন করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

দ্রুত স্বাবালকত্ব (Precocious Puberty)

কিছু হরমোন এর আধিক্যের কারণে সময়ের আগে (৯ বছরে বয়সের আগে) মাসিক শুরু হয়ে যাওয়া বা যৌবনের চিহ্ন আসা।

দেরীতে স্বাবালকত্ব (Delayeo Puberty)

কিছু হরমনের অভাবে ১৪ বছর বয়সেও যখন মাসিক শুরু বা শারীরিক বৃদ্ধি হয় না তখন একে Delayed Puberty বলা হয় এর কারণে নারী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

চিকিৎসা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

খাটো বা বেঁটে (Short Stature)

থাইরয়েড হরমোন বা গ্রোথ হরমোন এবং আরও কিছু কারণে নারী বা পুরুষ বেটে হতে পারে।

চিকিৎসা

১৪ বছর বয়সের আগে চিকিৎসা শুরু করলে তা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কুশিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome)

১। কর্টিসল হরমোনের আধিক্যের কারণে এই রোগ হয়। দীর্ঘদিন ধরে (ডেক্সামেথাসন, হাইড্রোকর্টিসন, প্রেডনিসোলন) গ্রহণকরলে বা শরীরে কিছু হরমোন গ্রন্থিতে টিউমার হলে এই রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণসমূহ

১। মোটা হওয়া
২। গায়ে ফাটা লালচে দাগ হওয়া।
৩। রুচি অনেক বেড়ে যাওয়া, মুখে লোম আসা, হাড় নরম হওয়া ও অল্পতেই ভেঙ্গে পড়া, মাসিক অনিয়মিত।

চিকিৎসা

সাবধানতার সাথে স্টেরয়েড ওষুধ বন্ধ করলে বা টিউমার থাকলে তা অপসারণ করে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

এডিসনস ডিজিজ (Addison's Disease)

কর্টিসল হরমোন এর অভাবে এই রোগ হয়ে থাকে। পুরুষ থেকে নারীর এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ৩ গুণ বেশি।

লক্ষণসমূহ

- অকারণ দুর্বলতা
- ত্বকের রং কালো হয়ে যাওয়া
- মুখের ভিতরে কালো দাগ
- হঠাৎ জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানা ও অজ্ঞান হওয়া
- রক্তে লবণের পরিমাণ (Chloride) কমে যাওয়া

চিকিৎসা

কর্টিসল হরমোন সঠিক মাত্রায় সেবন করে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা যায়।

শেষ কথা: ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগের সনাক্ত করে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চিকিৎসা করলে নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে এবং তারা পরিবার সমাজ তথা দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এখান দরকার শুধু একটু সচেতনতা।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রেগনেন্সি ও করণীয়

ডাঃ কানিজ ফাতেমা
এমবিবিএস, এফসিপিএস, সিএমইউ
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ
হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
সহকারী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

একজন মা যখন গর্ভবতী হন, মায়ের নিজের এবং পরিবারের সকলের প্রত্যাশা থাকে একটি সুস্থ সবল শিশুর। কিন্তু সন্তান জন্ম দেওয়ার আগের মূহুর্ত পর্যন্ত অনেক সময় বলা যায় না মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকবে কিনা। পুরো গর্ভকালীন সময়ে কোন অসুবিধা না থাকলেও প্রসবকালীন সময়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। মা ও শিশুর দুজনেরই জীবন বিপন্ন করতে পারে এই সব ঝুঁকি। কাজেই প্রেগনেন্সি এক অর্থে ঝুঁকিপূর্ণই বটে।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রেগনেন্সি বলতে, সেই সকল প্রেগনেন্সিকে বোঝায় যাতে মা ও শিশুর উভয়েরই স্বাস্থ্য গর্ভকালীন ও প্রসবের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন, কিছু কিছু মা আছেন গর্ভাবস্থার আগ থেকেই অথবা গর্ভকালীন সময়ে উচ্চরক্তচাপে ভোগেন। এই সকল মা অতীব ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের আওতায় পড়েন। এই সব জটিলতা আমরা সহজেই এড়াতে পারি যদি সঠিক সময়ে উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস মায়ের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের প্রেগনেন্সির আগেই কাউন্সেলিং এবং ডায়াবেটিস কন্ট্রোল দরকার। এ ছাড়া প্রেগনেন্সি অবস্থায় ঘনঘন মনিটরিং এবং দৈনন্দিন জীবনে কিছু পরিবর্তন আনার প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় হার্টের সমস্যা

স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় হার্টের কাজ অনেক গুণ বেড়ে যায়, শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে হার্টের কাজের ধরণও পাল্টে যায়, কাজেই কোন মায়ের যদি গর্ভাবস্থার আগে থেকেই হার্টের সমস্যা থাকে তা হার্টের উপর মারাত্মক চাপ বাড়ায় এবং মায়ের নানারকম শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এই সব মায়েদের জন্য নিজের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। হার্টের সমস্যা আছে এমন মায়েদের সন্তান ধারণ করার আগেই একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে হার্টের বর্তমান অবস্থা জেনে সন্তান ধারণ করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় কিডনি সমস্যা

কিডনি সমস্যা আছে এমন মায়েরা গর্ভাবস্থায় মারাত্মক ধরনের উচ্চরক্তচাপে ভোগেন। অনেক গর্ভাবস্থায় এসব মায়েদের কিডনি ফেইলিওর, প্রি একলাম্পসিয়া, একলাম্পসিয়ার মতো জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মায়ের কিডনিজনিত জটিলতার কারণে গর্ভস্থ শিশুর ঠিকমতো বৃদ্ধি হয় না। সময়ের আগে জন্ম নেয়া শিশুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়।

বারংবার গর্ভপাত

বারবার গর্ভপাত হচ্ছে এমন মায়েদের গর্ভপাত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান, তার সঠিক চিকিৎসা, সন্তান গ্রহণের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ, গর্ভধারণ করলে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তার বিশদ আলোচনা করা দরকার সন্তানকাঙ্খী দম্পতির সঙ্গে।

জন্মগত ত্রুটি

প্রতিদিনই অনেক শিশু নানা রকম জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। অতীব ঝুঁকিপূর্ণ মা যাদের ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার শুরু হতেই উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এই সকল শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই শিশু নিওনেটোলজি, শিশু শল্যবিভাগ, শিশু নিউরোলজি ইত্যাদি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব।

প্রতিটি মেয়ে স্বপ্ন দেখে একটি ফুটফুটে শিশুর কিন্তু অনেক মা আছেন যারা এই সীমাহীন সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত। দীর্ঘ নয় মাস সন্তান ধারণ করে যে সকল মা বিকলাঙ্গ ত্রুটিপূর্ণ কিংবা মৃত শিশুর জন্ম দিচ্ছেন সেই সকল মায়ের কষ্ট সন্তানহীন মায়ের থেকে অনেক বেশি। কাজেই শিশু জন্ম নেওয়ার আগেই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন আর সঠিক চিকিৎসা সঠিক সময়ে গ্রহণ করুন।

মেনোপজ বৃত্তান্ত

অধ্যাপক মেজর (অব.) ডাঃ লায়লা আর্জুমান্দ বানু
এমবিবিএস (ঢাকা), ডিজিও (ডিইউ) এফসিপিএস (অবস ও গাইনি) এফআইসিএস
চিফ কনসালটেন্ট, অবস এন্ড গাইনি
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা।

প্রথমবারের মতো কোন মেয়ের মাসিক (Period) হওয়া একটি মেয়ে কিশোরীতে রূপান্তর বলা যায়। এই নারীতে পদার্পন এর সাথে জড়িয়ে থাকে আরও কিছু ঘটনা; যেমন-শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন। তারপর সেই মেয়েটি একসময় বউ হবে, মা হবে। জীবনের যাতাকলে পড়ে একসময় আবিষ্কার করবে দিন তো চলে গেলো, আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে সুষমা। শারীরিক পরিবর্তনের একটা সময়ে মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে যাকে আমরা বলি মনোপজ বা ঋতুবন্ধ। একটি মেয়ের জীবনে এই ঘটনা প্রবাহ একেবারেই সাধারণ। কেউ চাক বা না চাক মেনোপজ হবেই। তাকে হয়ত কিছু দিন বিলম্বিত করা যাবে কিন্তু এড়নো যাবে না। তবে এইসব ঘটনা কি এমনিই ঘটে? না। আসলে মেয়েদের শরীরে মেয়েলী হরমোন এর তারতম্যে এই শরীরিক পরিবর্তন ঘটে। কিশোরী বয়সে যখন হরমোন এর প্রভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় তেমনি জীবনের শেষের দিকে এই হরমোনের অভাবে মনোপজ হয়। সাধারণত পুরো একবছর যদি ঋতুবন্ধ থাকে তা হলে আমরা মেনোপজ বলি। অনেক সময়ই নানা কারণে ঋতুবন্ধ (Amenorrhoea) থাকতে পারে। কিন্তু মোটামুটি ৪০ বৎসর এর পরে যদি এক বছর ঋতু বন্ধ থাকে তাকে মেনোপজ বলে।

মেনোপজের কিছুটা আগের সময়টাকে বলে পেরি মেনোপজ। যদিও এর কোন সঠিক সীমারেখা বা বয়সের মাপকাঠি নেই। তবে কিছু উপসর্গ দিয়ে একে চিহ্নিত করা হয়। যেমন– অনিয়মিত বা অল্প মাসিক হওয়া এবং অনেক দিন পর পর হওয়া। FSH হরমোনটি এ সময়ে বাড়তে থাকে। মজার কথা এই যে মেয়েদের হরমোন ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) এর সাথে FSH এর হচ্ছে উল্টো সম্পর্ক। মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের ইস্ট্রোজেন বেশি থাকে তখন FSH কম থাকে। কিন্তু যতই মেনোপেজর দিকে একজন নারী এগিয়ে যাবে ততই FSH বেড়ে যাবে। অনেক সময় আমরা এটাও বলে থাকি যদি কোন একটি মাত্র পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায় তার মেনোপজ হচ্ছে কি না তা হলো FSH লেভেল পরীক্ষা (>25|U|L)।

মেনোপজকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ১। স্বাভাবিক ও ২। কৃত্রিম

স্বাভাবিক মেনোপজ

মেয়েরা যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখনই তাদের ডিম্বাশয়ে (Ovary) তে প্রায় ৭০ লক্ষ ডিম থাকে। জন্মের সময় তা কমে দিয়ে ১০-১২ লক্ষে পৌঁছায়। আর কিশোরী বয়সে তা ৩-৫ লক্ষ হয়। প্রকৃতপক্ষে তৈরি হওয়ার পর থেকেই ডিমগুলো সংখ্যায় কমতে থাকে। পূর্ণ বয়স হলে যখন মাসিক শুরু হয় তখন প্রত্যেক মাসে একটি ডিম ফুটে (Ovulation)। অনেক ডিম না ফুটেই নষ্ট হয়ে যায়। মাত্র ৪০০-৫০০ ডিম সারাজীবনে ফুটে থাকে। এই ডিম বা Follicle থেকেই মেয়েদের হরমোন তৈরি হয় তাই যতই মেনোপজের দিকে এগনো যায় ততই হরমোন কমতে থাকে এক পর্যায়ে শূন্য হয়ে যায়। অথবা যেগুলো থাকে সেগুলো কাজ করে না।

মেনোপজ সাধারণত ৫০-৫১বছরে হয়ে তাকে। এই মেনোপজ কিন্তু মাসিক, বিয়ে, বাচ্চা হওয়া, ওজন অথবা পিল খাওয়া কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।

যদি ৪০ বৎসরের আগে মনোপজ হয় তা হলে তাকে বলে POF Premature Ovarian Failure বলি তবে আমরা এখন সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তাছাড়া এর কোন সার্বিক কারণও জানা নেই শতকরা ১% মহিলার ক্ষেত্রে এমন হতে পারে।

কৃত্রিম মেনোপজ

যদি অপারেশন করে ২টি ওভারী (Ovary) বা ডিম্বাশয় ফেলে

দেওয়া হয় অথবা তেজস্ক্রিয় রশ্মি, কেমোথেরাপী অথবা কোন কারণে ডিম্বাসয়ের রক্ত সঞ্চলন কমে যায় তাহলেও মেনোপজ হতে পারে।

মেনোপজ হবার ফলে শরীরের বিভিন্ন হরমোনের ঘাটতি অথবা আধিক্য ঘটে। পুরুষ হরমোন (Androgen) প্রায় শতকরা ৫০% কমে যায় কিন্তু ইস্ট্রোজেন বেশি কমাতে এন্ড্রোজেনের কিছুটা আধিক্য হয় তার ফলে মেনোপজের পরে অনেক মহিলার কিছু দাড়ি গোঁফ এর আধিক্য দেখা যায়।

মেয়েদের হরমোন ইস্ট্রোজেন অনেক কমে যাওয়ায় বার্ধক্যের ছাপ দেখা যায়। চামড়া কুচকে যায়, লাবন্য নষ্ট হয়ে যায়, হাড় নরম হয়ে যায় এবং হৃদরোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। অনেকে এ জন্য কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন নিয়ে থাকে তাদের এইসব উসর্গ কিছুট কম হয়। শীর্ণ মহিলাদের থেকে মোট মহিলাদের মেনোপজের উপসর্গ কম হয়ে থাকে কারণ বেশি ওজনের মহিলাদের শরীরের চর্বির মধ্যে ইস্ট্রোজেন জমে তাকে তাই অনেক সময় দেখা যায় এদের অনেকদিন পর্যন্ত হরমোনের প্রভাব থাকে। তবে অতিরিক্ত ওজন কখনই ভালো নয়। এই ওজনই আবার অন্য রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শারীরিক পরিবর্তন এভাবে হতে পারে

প্রজননতন্ত্রে ইস্ট্রোজেনের অভাবে যোনীপথ শুকিয়ে যায় বা শুস্ক হয় এবং প্রদাহ ও ইনফেকশন হয়। মেনোপজের সময় শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় নানা ধরনের অসুখ হয় এবং স্বামী স্ত্রীর মেলামেশার সময় ব্যথা অনুভব হয়। জরায়ু ও জরায়ু মুখও শীর্ন হয়ে যায়, এতে অবশ্য একটাই লাভ হয় যদি কারও জরায়ুতে আগে থেকে টিউমার থাকে তবে তা কমে যায়। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না এ ছাড়া এই সময়ে হরমোনের অভাবে জরায়ু নীচে নেমে যায়। প্রসাবে প্রদাহ হয়ে ঘন ঘন ইনফেকশন মানে জ্বালা পোড়া হয়। তাই প্রসাবের ইনফেকশনের চিকিৎসায় হরমোন যোগ করলে রোগী তাড়াতাড়ি ভালো হয়।

প্রতিকার ও চিকিৎসা

মেনোপজ হলেই যে জীবন শেষ হয়ে যায়, নারীত্ব শেষ হয়ে যায় তা নয়। রোগীকে বোঝাতে হবে একজন মহিলার জীবনের এক তৃতীয়াংশ বা বেশি সময়ে মনোপজে কাটাতে হয়। তাই এই সময়টাতে অর্থবহ করে তুলতে হবে। নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।

স্বাভাবিক হাঁটাচলা কাজ কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। নিয়ম করে দুবেলা হাঁটতে হবে। এ সময়ে হরমোনের অভাবে মহিলাদের কিছুটা মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কাজেই পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে স্বামীর ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বামীকে সহানুভূতিশীল, সহমর্মী হতে হবে, স্ত্রীকে সময় দিতে হবে সেই সঙ্গে গুরুত্বও দিতে হবে।

শারীরিক উপসর্গ প্রথমেই হট ফ্লাশের কথা বলি। হট ফ্লাশ মানে হচ্ছে হঠাৎ করে গরম লাগা অথবা ঠান্ডা লাগা। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া কিংবা অস্থির লাগা। এর জন্য হরমোন ক্লোনিডিন গ্রুপের ওষুধ এবং কিছুটা ঘুমের ওষুধ বেশ ভালো কাজ করে। অনেক সময় রোগী চিকিৎসকের কাছে হট ফ্লাশ নিয়েই প্রথম রিপোর্ট করে।

ব্যথাযুক্ত সহবাস

বিশেষত যোনীপথের শীর্ণতার কারণে সহবাসে ব্যথা হয়ে থাকে। এতে হরমোন খাওয়া এবং ক্রিম হিসেবে ব্যবহার এবং কিছু লুবরিকেন্ট ব্যবহারে ব্যথা প্রশমন করা যায়।

হাড় ক্ষয়ে যাওয়া

মেনোপজে এটা একটা মারাত্মক রকমের জটিলতা। শরীরের হাড় শক্ত থাকার জন্য ক্যালসিয়ামের সাথে হরমোন (ইস্ট্রোজেন) অপরিহার্য। তাই হরমোনের অভাবে শরীরের হাড় দুর্বল হয়ে ক্ষয় হয়ে যায়। এর ফলে সহজেই হাড় ভেঙে যায়। এ জন্য মাঝে মধ্যেই BMD নামক একটা পরীক্ষা করানো দরকার এতে শরীরের ক্যালসিয়াম এর পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। প্রথমে Osteopenia এবং পরে Osteoporosis দেখা দেয়। কাজেই ৩০ বছরের পর থেকেই নিয়মিত ক্যালসিয়াম খাওয়া দরকার।

দৈনিক অন্তত ১২০০-১৫০০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম খাওয়া উচিত। যেখানে একটি ক্যালসিয়াম বড়ি সাধারণত ৫০০ মি: গ্রাম হয় কাজেই ৩টি না হলেও কমপক্ষে ২টি ক্যালসিয়াম বড়ি খাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া দুগ্ধজাত খাবার, ছোট মাছ এ প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ভাঙা ছাড়াও পিঠে বা কোমড়ে ব্যথা হতে পারে। অনেকের ভুল ধারণা থাকে হরমোন খেলে ক্যান্সার হয়। এটা ঠিক নয়। প্রথম ৫ বৎসর কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই হরমোন খাওয়া যেতে পারে। তবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

এ ছাড়া মেনোপজের সময় ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার খাওয়া খুবই জরুরি। মেনোপজের সময়ে খাদ্যাভাসের কিছুটা পরিবর্তন দরকার। সহজপাচ্য খাবার খাওয়া ভালো, নিয়মিত হাঁটাচলা, খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। যাদের ডায়াবেটিস আছে মেনোপজে তাদের জটিলতা বেশি দেখা যায় তাই সামান্য অসুবিধা হলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ। মনোপজের সময় শারীরিক প্রতিরোধ কিছুটা কমে যাওয়াতে নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য নিয়মিত হেলথ চেকআপ জরুরি। এতে অনেক মারাত্মক রোগ প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরা পড়ে। অবশেষে এটাই বলা যায় ঋতুবন্ধ বা মেনোপজ মানেই জীবন শেষ হওয়া নয় এটা জীবনের একটা পরিবর্তন, একে হাসিমুখে মেনে নেওয়া ও করণীয় কাজগুলো ঠিকমত করলে জীবনটা সুন্দর ও অর্থবহ হতে পারে।

[HOTLINE : 10606]

বন্ধ্যাত্ব শুধু নারীর সমস্যা নয়

পুরুষদেরও থাকতে পারে বন্ধ্যাত্বতা। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF)-এর মাধ্যমে নারী বা পুরুষ যে কারও বন্ধ্যাত্বকে জয় করে সন্তান পাওয়ার আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেন।

বন্ধ্যাত্ব থেকে সন্তান ধারণ পর্যন্ত সব পর্যায়ের পরিপূর্ণ সুচিকিৎসার জন্য সুদক্ষ চিকিৎসকদল ও অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি নিয়ে আপনার স্বপ্ন পূরণে :

ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার

ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার
...where blossoms your dream baby

বিস্তারিত জানতে : ০১৭৬৬৬৬০১৯৮

ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

বাড়ি ৬, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন: ৯৬৭৬৩৫৬, ৮৬১০৭৯৩-৮

ওয়েব: www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

বন্ধ্যাত্বকে জয় জন্ম জয়

ডাঃ মরিয়ম ফারুকী (স্বাতী)
এমবিবিএস, এমসিপিএস, এমএস,এফসিপিএস, ডিজিও (গাইনি)
প্রসূতি, স্ত্রীরোগ ও বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনি ও অবস্ বিভাগ
ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার, ঢাকা।

বন্ধ্যাত্ব বা ইনফার্টিলিটি (Infertility) একটি সাধারণ গাইনি অসুস্থতা। যদিও এটা জীবন ঝুঁকিপূর্ণ অসুখ নয় তবুও এই কষ্টের বিশালতা অনেক। এটা দাম্পত্য জীবনের স্বামী-স্ত্রী থেকে পুরো পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় এক সময়।

একটি পরিবারে বন্ধ্যাত্ব হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের যে কারো সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের পূর্বের সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীকেই দায়ী করা হত। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এটাও উদ্ভাবিত হল যে একজন স্বামীও শারীরিক অথবা মানসিকভাবে বন্ধ্যাত্ব রোগে ভুগতে পারেন।

ইনফার্টিলিটির কারণ নানাবিধ। ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্ব বলতে বোঝায় একজন দম্পতি এক বছর সুস্থ জীবন যাপন করে কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেন নাই। এটা গাইনি সমস্যার মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ দেখা যায়। এতে একজন স্ত্রীর সমস্যা দায়ী শতকরা ৩৩ ভাগ, স্বামীর সমস্যা শতকরা ৩৩ ভাগ এবং কিছু সমস্যা রয়ে যায় Unexplained বা বোঝা যায় না, সেটি শতকরা ৩৩ ভাগ।

মেয়েদের সমস্যার মধ্যে ডিম্বাশয়ের সমস্যা, টিউবের সমস্যা অথবা জরায়ুর সমস্যা থাকতে পারে।

এ ছাড়া মেয়েদের বেশি বয়স একটি বড় সমস্যা, মানসিক চাপ, খাদ্যের অপুষ্টি, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ এবং মদ্যপান, ধূমপান অথবা মাদকাসক্তিও কারণ হতে পারে। এ ছাড়া Radiation অথবা কেমোথেরাপিও দায়ী হতে পারে।

অধিক বয়স সন্তান ধারণ ক্ষমতা হ্রাস করে। ৩৫ বছর পর শতকরা ৩৩ জন দম্পতির সন্তানহীনতায় ভোগেন। এ সময় ডিম্বাশয়ে ডিমের পরিমাণ কমে যায় এবং গুণাগুণও বদলে যায় তদুপরি গর্ভপাতের হারও বেড়ে যায়। ৩৫ বছরের নীচে মহিলারা এক বছর নিজেরা চেষ্টার পর ও ৩৫ উর্ধ্ব মহিলারা ৬ মাস চেষ্টার পর অবশ্যই ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ এর শরণাপন্ন হবেন।

ছেলেদের বেলায় Varicocele অথবা শুক্রকীটের সমস্যা অথবা অন্যান্য অসুখ কারণ হতে পারে চিকিৎসক দম্পতিকে এক সাথে এবং কোন ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পরামর্শ করবেন।

প্রথমত সময় ও মনোযোগ দিয়ে দম্পতির কাছে History নিতে হবে।

Conjugal life এর অসুবিধা কিনা জানতে হবে। তারপর Basic পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে– তার মধ্যে আছে স্বামীর Semen Analysis, স্ত্রীর জন্য Ovulation Test, সনোগ্রাফী, হিস্টরস্কপি অথবা ল্যাপারস্কপি।

এই বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার জন্য রয়েছে ওষুধ অথবা সার্জিক্যাল ব্যবস্থা। এ ছাড়া আছে Artificial Insemination এবং Assisted Reproduction ব্যবস্থা।

পুরো চিকিৎসাটাই কি ধরনের সমস্যা তার উপর নির্ভর করবে। বর্তমানে এই সমস্যা সমাধানে নানা ধরণের সেবনযোগ্য ওষুধ ও ইনজেকশন রয়েছে। এ ছাড়া IUI পদ্ধতিতে স্বামীর Semen স্ত্রীর জরায়ুতে পৌঁছে দেওয়া হয় Tube এর মাধ্যমে। ART (Assisted Reproduction Technology) তে স্ত্রী ডিম্বাশয় থেকে ডিম বাইরে এনে তা স্বামীর শুক্রকীটের সাথে সমন্বয় করে ভ্রুণ তৈরি হলে তা আবার স্ত্রীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে দেয়া হয়। এই পদ্ধতি আজ বহুল শ্রুত IVF বা Test tube পদ্ধতি নামে। এর সাফল্যের হার শতকরা ৩০ ভাগের মত।

গর্ভধারণ করার নানা ধাপ আছে প্রথমত, স্ত্রীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম বহির্গমন হতে হবে। ডিম্বটি Fallopian tube দিয়ে যাবে এবং সেখানে স্বামীর শুক্রকীটের সাথে মিলিত হবে।

এই সম্মিলিত ভ্রুণ জরায়ুর দিকে যাবে এবং জরায়ুর ভিতরের ঝিল্লি (Endo Metrium) তে গিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়বে। এই সকল ধাপের মধ্যে যে কোন জায়গায় বাঁধাগ্রস্থ হলে দম্পতি সন্তানহীন রোগে ভুগতে পারেন।

কিন্তু আশার কথা এই সকল সমস্যার চিকিৎসায় বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট। কোন নিঃসন্তান দম্পতিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুপরামর্শ দিয়ে সাফল্য আনা যায়। আবার কারো বেলায় সর্বোচ্চ IVF চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। কাজেই যিনি বা যে দম্পতি এ ধরনের সমস্যায় আছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে এসে পরামর্শ নিতে দেরী করবেন না।

রক্তসল্পতার অল্প কথা

ফাহমিদা হাশেম
পুষ্টিবিদ
বডি কম্পোজিশন এনালাইসিস ডিপার্টমেন্ট
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল

রক্তসল্পতা বা এনিমিয়া বিশ্বব্যাপী একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রক্তসল্পতার হার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। রক্তসল্পতা অসুখের পূর্ব লক্ষণ হতে পারে বা কখনো নিজেই একটি রোগ হতে পারে। রক্তসল্পতা মানে রক্ত কমে যাওয়া নয় বরং রক্তের উপাদান লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলেই রক্তসল্পতা দেখা দেয়। এই স্বাস্থ্য সমস্যাটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশি। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের রক্তসল্পতা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দশজন মহিলার একজন এই রোগে ভোগেন। আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যু এবং প্রসূতি মৃত্যুর অন্যতম কারণ হচ্ছে রক্তসল্পতা।

রক্তসল্পতার কারণ

রক্তে হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন হ্রাস পেলে এবং দীর্ঘদিন ধরে কম আয়রনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে রক্তসল্পতা দেখা দিতে পারে। রক্তসল্পতা যে সব সময় আয়রনের অভাবেই হয়, তা নয়। দেহে ভিটামিন বি১২ অথবা ফলিক এসিডের অভাব, থ্যালাসেমিয়া, লিউকোমিয়া, মাসিক, গর্ভধারণ (১৮ বছরের নিচে দুটি বাচ্চা হলে অ্যানিমিয়া সবচেয়ে বেশি হয়), সন্তান প্রসব, পাইলস, কৃমির আক্রমণ,ম্যালেরিয়া, জন্মগত রক্তশূণ্যতা, লিভারের অসুখ, বিভিন্ন প্রকার ওষুধ সেবন, প্রোটিনজাতীয় খাবার গ্রহণে অনিহা, ভুল খাদ্যাভাস ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণা থেকেও হতে পারে।

রক্তসল্পতা দূরীকরণে খাদ্য

অনেকেই রক্তসল্পতা হলে না জেনে আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে থাকেন। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া উচিত নয়। আসুন জেনে নেয়া যাক রক্তসল্পতা দূর করে এমন কিছু খাবারের কথা।

রক্তসল্পতা রোধে গর্ভবতী মা, শিশুদের লৌহসমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে দিতে হবে। প্রাণীজ আমিষ যেমন কলিজা, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে প্রচুর ভিটামিন বি-১২ আছে এবং যা মানব দেহ সহজে গ্রহণ করে। এ ছাড়া সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, শিমের বিচি, ছোলা, ডাল ইত্যাদিতে প্রচুর ফলেট থাকে যা রক্তসল্পতা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে, তাই এসব খাবার পরিমিত মাত্রায় আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখুন। কালো কচু শাক, ধনেপাতা, ডাটা শাক, আমচুর, পাকা তেঁতুল, ছোলা শাক, চিড়া, সরিষা শাক, সজনে শাক, ফুলকপির পাতা, হেলেঞ্চা, ডাল-লেবু, ফুলকপি, আয়রন সমৃদ্ধ আটা, কালোজাম, চিড়া, শালগম, কলিজা, চিংড়ি এবং শুঁটকি মাছেও আয়রন রয়েছে। মাংস, ডিম এবং মাছ থেকে যে আয়রন পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ আয়রনের চেয়ে দুই থেকে তিন গুণ বেশি কার্যকর। মাংস, কলিজা, ডিমের কুসুম এবং বিভিন্ন মাছে (টাকি মাছ) প্রচুর পরিমান প্রাণিজ আয়রন থাকে। উদ্ভিজ আয়রনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ডাল, সয়াবিন, গমের আটা, সিমের বিচি, বরবটি ইত্যাদি। মাছের মাঝে, ভালো আয়রনের উৎস হল সামুদ্রিক মাছ। শিং মাছ, ইলিশ মাছ, ভেটকি মাছ, টেংরা মাছ

রক্তসল্পতা বোঝার উপায়

রক্তসল্পতা প্রকট হলে নিচের উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে-

১) কাজকর্মে অনীহা দেখা দেবে
২) হাত-পায়েরতালু ফ্যাকাশে হয়ে যাবে
৩) জিহ্বার স্বাদ ও অনুভূতির স্বাভাবিকতা নষ্ট হবে
৪) অবসাদ, দুর্বলতা, ক্লান্ত, বুক ধড়ফড় করতে পারে
৫) স্বল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হওয়া
৬) মাথা ঝিমঝিম করা
৭) চোখে ঝাপসা লাগা
৮) মাথাব্যথা করা
৯) হাত-পা ঝিনঝিন করা ও অবশভাব হওয়া
১০) চোখ সাদা হয়ে যাওয়া
১১) ক্ষুধামন্দা ও বদহজম হওয়া

এ ছাড়া লৌহের অভাবজনিত কারণে যেটা আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় তা হলো রক্তসল্পতা হলে মুখের কোণায় ঘা হয়, নখের ভঙ্গুরতা বেড়ে যায়।

ইত্যাদি সব মাছেই প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে। যারা হৃদরোগে আক্রান্ত বা এর ঝুঁকিতে আছেন তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাদ্যতালিকা নির্বাচন করুন।

নিত্যদিনের উদরপূর্তি

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সর্বনিম্ন ৬০ গ্রাম মাছ রাখলে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করা যাবে। দুধে খুব বেশি পরিমাণে আয়রন না থাকলেও এতে প্রায় সব রকমের ভিটামিন বি আছে। এ ছাড়াও দুধে আছে পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম। তাই রক্তস্বল্পতা রোগীদের জন্য নিয়মিত অন্তত এক গ্লাস করে দুধ খাওয়া উপকারী।
মধু আয়রনের একটি ভালো উৎস। আয়রন ছাড়াও মধুতে কপার ও ম্যাঙ্গানিজ আছে। তাই রক্তস্বল্পতা কমাতে মধু একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বিভিন্ন রকম সবজি যেমন কচু শাক, কচুর লতি, কচু, পালং শাক, বিট, লেটুস, ব্রকোলি, ধনিয়া পাতা এবং পুদিনা পাতা , কাঁচাকলা, পেয়ারা, শিম, মটরডাল, বাঁধাকপি নিয়মিত বেশি করে খেলে রক্তস্বল্পতা থেকে মুক্তি মেলা সম্ভব। এই শাক সবজিগুলোতে আয়রনের পাশাপাশি ভিটামিন বি-১২,ফলিক এসিড ও অন্যান্য শক্তিবর্ধক খাদ্য উপাদান আছে যেগুলো রক্তের হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। বিশেষ করে বিটের জুস রক্তস্বল্পতায় অত্যন্ত উপকারী।

ফলেও হবে সমাধান

প্রতিদিন আয়রন যুক্ত ফল যেমন আপেল, টমেটো, কলা, আঙুর, পেঁপে, কালোজাম, পাকা তেঁতুল, কাঁচা আম, কমলা, তরমুজ, কিসমিস, ইত্যাদি খেলে রক্তস্বল্পতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ডালিমে আয়রনসহ অনেক মিনারেল রয়েছে। দিনে ৩ বার ১ গ্লাস বেদানার রস খাবারের আগে খেলে ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে রক্তস্বল্পতা কমে আসে। কেবল লৌহসমৃদ্ধ খাবার খেলে চলবে না, ভিটামিন সি পাওয়ার জন্য নিয়মিত খেতে হবে লেবু, জাম্বুরা, চালতা, জাম, টমেটো, কমলা, আঙুর, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, কাগজি লেবু, আমলকী, জামবুরা, কুল আমড়া, মালটা ইত্যাদি।

শেষ কথা

রক্তস্বল্পতার উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া বাঞ্ছনীয়। অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশের অসংখ্য মহিলা ও গর্ভবতী মায়েরা রক্তস্বল্পতায় ভোগে। অথচ একটু সচেতন হলেই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমাদের চারপাশে অনেক দেশীয় শাক-সবজিও ফলমূল রয়েছে যেগুলো দামে সস্তা এবং সহজেই পাওয়া যায়। তাই আমাদের আগে থেকেই সচেতন হতে হবে সঠিক খাদ্যের প্রতি। মনে রাখতে হবে রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করাই ভালো।

শীতকালে হাঁপানী রোগের প্রকোপ খুব বাড়ে। এ সময়টায় শ্বাসকষ্টও দেখা দেয় কারো কারো। কখনো সঙ্গে থাকে কাশি, জ্বরের মতো অনুষঙ্গও। এ সমস্যা থেকে দীর্ঘস্থায়ী সুফল পেতে 'মন্টেলুকাস্ট' জাতীয় ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শমতে ব্যবহার করতে পারেন। ল্যাবএইড ফার্মার 'মন্টিল্যাব' এ ধরনের একটি ওষুধ। দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে থাকে মন্টিল্যাব।

- DMF grade API to ensure quality
- Highly effective in prophylaxis and chronic treatment of asthma
- Gold standard drug for asthma associated with allergic rhinitis
- Effective & safe for children

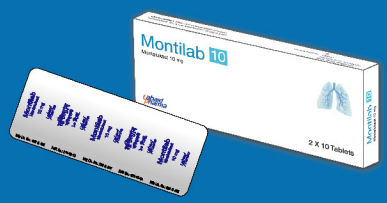

Labaid Pharma introduces

Montilab

Montelukast 10 mg Tablet

An effective option to control asthma

Labaid Pharma Quality First...

অফিসেই ব্যায়াম!

ডাঃ সিদ্ধার্থ মজুমদার
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
ল্যাবএইড ফার্মাসিউটিক্যালস

যাদের নিয়মিত অফিস করতে হয় তাদের সারাদিনের বড় একটা অংশই কেটে যায় অফিসে। অফিস শেষে ক্লান্ত শরীরে আর ব্যায়াম করা হয়ে ওঠে না। আর কর্মক্ষেত্রে যাদের চেয়ার টেবিল আর কম্পিউটার ঘিরে কাজ তাদের ওজন বেড়ে যাবার প্রবনতা থাকে খুব দ্রুত। এছাড়া পিঠ, কোমড়, ঘাড় ব্যথা থেকে শুরু করে চোখের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। একটানা টেবিল চেয়ারে বসে যারা কাজ করেন, তারা প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ২০ সেকেন্ডের জন্য উঠে দাঁড়াবেন, আর যাদের কাজ দাঁড়িয়ে, তারা প্রতি ২০ মিনিট পর ২০ সেকেন্ড হলেও বসে নেবেন। এছাড়া চেয়ারে বসতেও হবে মেরুদণ্ড সোজা করে। যারা নিয়মিত টেবিল চেয়ারে বসে কাজ করছেন, তারা এবার জেনে নিন কিছু অফিস উপযোগী ব্যায়াম।

১ চেয়ারের পাশে

- প্রথমেই চেয়ারের পিছনে দাঁড়ান। দুই হাতে ধরে রাখুন চেয়ার। এবার বাম পা ডান পায়ের কাফ মাসেলে স্পর্শ করুন।

- পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়ান। এভাবে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড স্থির থাকুন।
- পা পাল্টে এরকম অন্তত তিনবার করুন নিয়ম করে।

২ বসে থেকে

- পশ্চাদদেশের এক অংশ চেয়ার থেকে উপরে তুলে ফেলুন। এবং সেখানকার মাংসপেশীর উপর চাপ প্রয়োগ করুন।

- এভাবে অন্তত ১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। এবার পশ্চাদদেশের অপর পাশে ঠিক একইভাবে সম্পন্ন করুন প্রক্রিয়াটি।

চোখ উঠলে আঁতকে ওঠা নয়

কালো সানগ্লাসে চোখ ঢাকা মানুষের সংখ্যা রাস্তায় বাড়ছে আজকাল। যতটা না ফ্যাশন সচেতন তারা, তারচে বরং চোখ ওঠার কারণেই বাধ্য হয়ে পড়ছেন চশমা। চোখ ওঠাকে কনজাংটিভাইটিস বা রেড/পিংক আই বলে। সাধারণত চোখের পর্দায় প্রদাহ হলে তাকে চোখ ওঠা রোগ বলা হয়। চোখ ওঠার কারণ হলো ভাইরাসজনিত। ব্যাকটেরিয়া ও অ্যালার্জিজনিত কারণেও চোখ ওঠে। চোখ ওঠা চোখের দিকে তাকালে কারোর চোখ ওঠে না। ভাইরাসে আক্রান্ত চোখ কিছুদিন পর ভালো হয়ে যায়। কারও এক সপ্তাহে ভালো হয়ে যায়, কারও আবার তিন সপ্তাহ লাগতে পারে। সেটা নির্ভর করে কী ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ এবং রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর।

যেভাবে ছড়ায় রোগ

চোখ ওঠার পর প্রায়শই আমরা চোখে হাত দেই। এরপর থেকে সেই হাত দিয়ে আমরা যা কিছুই ছুঁই না কেন, সেখানে ভাইরাস চলে আসে। যেমন কারও সঙ্গে করমর্দন, দরজার হাতল, টিভি রিমোর্ট, ব্যবহৃত তোয়ালে, বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, এমনকি মুঠোফোন ইত্যাদি।

লক্ষণ সমূহ

চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হওয়া, অনেক সময় চোখের পাতা ফুলে যাওয়া, কারও ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া এবং আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এ সময়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ধুলাবালু থেকে রক্ষা পেতে কালো চশমা পরতে পারেন
- চোখের পানি বা ময়লা মোছার জন্য আলাদা পরিস্কার কাপড় ব্যবহার করা
- চোখের পাতা বেশি ফুলে গেলে বরফ দেওয়া যেতে পারে
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু ওষুধ খাওয়া কিংবা চোখে দিতে হবে
- হাত না ধুয়ে যখন-তখন চোখ ঘষা, চুলকানো বা চোখে হাত দেয়া যাবে না
- কর্নিয়ার প্রদাহ হলে সময়মতো চিকিৎসাসেবা না নিলে স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি কমার শঙ্কা থাকে। তাই প্রয়োজনে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

৩ বসতে হবে যে ভাবে

■ চেয়ারটি এমনভাবে উঁচু করে দিন, যেন আপনার পায়ের পাতা মঝে থেকে খানিকটা উপরে থাকে। মেরুদণ্ড সোজা করে পেটের মাসেল শক্ত করে বসুন।

■ এবার বসে থেকেই ডান হাঁটু আস্তে ধীরে কোমরের উপরে তুলতে হবে। এভাবে ধরে রাখুন ১০ সেকেন্ড।

■ এবার অপর পা ব্যবহার করে একইভাবে করুন এভাবে প্রতিদিন অভ্যাস করুন অন্তত ১৫ বার।

৪ বোতল ব্যায়াম

■ পানি স্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জীবন ধারনের জন্য যেমন পানি, তেমনি রোগ ব্যাধি দূরে রাখতেও খেতে হবে পর্যাপ্ত পানি। শুধু পানিই না, পানির বোতলও যে জরুরি হয়ে উঠতে পারে, দেখে নিন।

■ পানির বোতল বক্ষ বারবার সোজা করে ধরুন। এবার আগের অবস্থানে ফিরে আসুন

■ এবার ঠিক একই রকমভাবে দুই হাত দিয়ে বোতল ধরা অবস্থায় শরীর বাম দিকে বাঁকান

■ ডান দিকে আস্তে আস্তে শরীর বাঁকাতে হবে যতখানি পারা যায়

৫ দাঁড়িয়ে এবার

■ চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে এক পা সামনে উপরের দিকে প্রসারিত করুন। পা সোজা করে ধরে রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আনুন। এক পা শেষ হলে, অন্য পা ব্যবহার করুন।

■ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবার এক পায়ে ভর দিয়ে পা টি সামনে পিছনে বাঁকা করুন। এবার অন্তত ৩০ সেকেন্ড ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন।

অনেক গবেষণা, অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো শেষে ক্যাপসুলের জিলাটিন শেলের অনেকগুলো বিকল্প আমাদের হাতে এসেছে। এর মধ্যে হাইড্রক্সিল প্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ, স্টার্চ, পলিভিনাইল অ্যালকোহল কো-পলিমার, পুলুল্যান উল্লেখযোগ্য। হাইড্রক্সিল প্রোপাইল মিথাইল সেলুলোজ দিয়ে তৈরি শেলকে বলা হয়ে থাকে ভেজিটেবেল শেল। এই শেল উদ্ভিজ উৎস থেকে আসে বলে এটির গ্রহনযোগ্যতা বাড়ছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে প্রাণীজ উৎসের ওষুধ গ্রহণে, অনেকেই সন্ধিহান থাকেন। সে ক্ষেত্রে ভ্যাজিটেবল শেলে তৈরি ক্যাপসুল সবচেয়ে ভালো বিকল্প এবং নির্ভরযোগ্য। এ ছাড়া প্রানীজ উৎস থেকে তৈরি শেল, বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনকেফালোপ্যাথি, ট্রান্সমিসবল স্পঞ্জিফর্ম এনকেফালোপ্যাথির মতো রোগের জীবাণু বহন করতে পারে। ভেজিটেবল শেলে সেই শঙ্কা থাকে না একেবারেই। ল্যাবএইড ফার্মা 'পেপট্রাল' নামে ওমিপ্রাজল জাতীয় ওষুধ ভেজিটেবল ক্যাপসুল শেলে করে বাজারজাত করছে। এই 'পেপট্রাল' ছোট সাইজের ক্যাপসুল হওয়ায় খুব সহজে গ্রহণ করা যায়। চিকিৎসকের পরামর্শে 'পেপট্রাল' গ্রহণ করে পাকস্থলীর অতিরিক্ত এসিডজনিত সমস্যা থেকে দূরে থাকুন।

Peptral
Omeprazole

AN EXCLUSIVE BREAKTHROUGH
WITH
SMALL VEGETABLE CAPSULE SHELL

- Smallest vegetable capsule shell ever in Bangladesh
- Free from animal tissue, so no risk of BSE & TSE
- No religious restriction for intake
- Ensures maximum bioavailability
- Vegetable capsule shell ensures better absorption

BSE = Bovine Spongiform Encephalopathy
TSE = Transmissible Spongiform Encephalopathy

Peptral
Omeprazole 20 mg

Labaid Pharma Quality First...

সোনিয়াকে আর এক পায়ে হাঁটতে হবে না

ছোট বেলায় পা হারিয়ে এক পায়ে হাঁটতে হতো রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার কিশোরী সোনিয়া খাতুনকে (১২)। এখন থেকে তাকে আর এক পায়ে হাঁটতে হবে না।

পুঠিয়ার ধোপাপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এই ছাত্রীর কাঁটা পা প্রতিস্থাপন (কৃত্রিম পা দিয়ে) করেছে ল্যাবএইড। শুধু তাই নয়, সোনিয়ার সারা জীবনের শিক্ষার ব্যয়ভারও বহন করবে

প্রতিষ্ঠানটি। মাত্র ২ বছর বয়সে ট্রেনে কাঁটা পড়ে পা হারায় সোনিয়া। সেই থেকে এক পা নিয়েই চলছিল তার জীবন সংগ্রাম। সোনিয়ার বাবা মজিবুর রহমান মানসিক প্রতিবন্ধী। মা রহিমা বেগম অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান। অভাবের সংসারে তাই সোনিয়ার পরিবারের পক্ষে তার কাঁটা পায়ের স্থানে নতুন পা প্রতিস্থাপনের কোন পথই তারা খুঁজে পাচ্ছিল না।

গত ৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে একটি জাতীয় পত্রিকায় "এক পায়ে প্রতিদিন পাঁচ কিলোমিটার" শিরোনামে সোনিয়াকে নিয়ে একটি সংবাদ ছাপা হলে বিষয়টি ল্যাবএইড কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এই সংবাদের ভিত্তিতে ল্যাবএইড কর্তৃপক্ষ সোনিয়ার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে। এরপর দুই দফা সোনিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের ঢাকায় এনে তার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার একটি বেসরকারী ক্লিনিকে সোনিয়ার কৃত্রিম পা সংযোজোনের ব্যবস্থা করা হয়। যার সকল খরচ ল্যাবএইড বহন করে। শুধু তাই নয় গত এপ্রিল মাস থেকে সোনিয়ার সকল প্রকার পড়াশোনার খরচ বহন করে আসছে ল্যাবএইড।

বাড়ি ফিরে যাবার আগে সোনিয়া তার পরিবারের সদস্য ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলামকে নিয়ে দেখা করতে আসে ল্যাবএইড কর্তৃপক্ষের সাথে। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ল্যাবএইড গ্রুপের সাইফুর রহমান লেনিন বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কাজের ক্ষেত্রে ল্যাবএইড সব সময় চেষ্টা করে তাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে কিছু সহযোগিতা করতে। সোনিয়া খাতুনের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেও ল্যাবএইড তার সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং করবে।

উল্লেখ্য, ল্যাবএইড কর্তৃপক্ষ এরকম সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক নির্মল সেনের (মৃত) যাবতীয় চিকিৎসা খরচ বহন করেছে, পাবনার কবি ওমর আলীর নিয়মিত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও খরচ বহন করে আসছে এবং সেই সাথে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী শেফালি আক্তারের মেডিকেল কলেজের পড়ার সকল শিক্ষাব্যয় বহন করছে।

বন্যাদুর্গতদের পাশে ল্যাবএইড

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ ইউনিয়নের বীর হলকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১ হাজার নারী পুরুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে ল্যাবএইড। ল্যাবএইড গ্রুপের চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের দেয়া বিপুল পরিমান কাপড় এবং কর্তৃপক্ষের দেয়া শুকনো খাবার (চিড়া, গুড়), মোম, দেয়াশলাই, স্যালাইন বিতরণ করা হয় বন্যার্তদের মাঝে। বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন ল্যাবএইড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের জিএম (সেলস) মনিরুল ইসলাম ভুঁইয়া, ল্যাবএইড গ্রুপের কর্পোরেট কমিউনিকেশন এজিএম সাইফুর রহমান লেনিন। আরও ছিলেন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান, আবুল কালাম আজাদ, মেয়র নুরন্নবি অপু, দেওয়ানগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুসহ আরও অনেকে।

এক্সিকিউটিভ

হেলথ চেক-আপ

বিভিন্ন রোগের প্রকোপ যেমন বাড়ছে তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষের সচেতনতাও বাড়ছে। তবে কিছু মানুষের প্রবণতা আছে রোগ দেখা দিলে বা সমস্যা তৈরি হলে তবেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলে রোগ হওয়ার আগেই ধরা পড়ে। নিয়মিত হেলথ চেক-আপ আপনাকে অনাগত অনেক শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে দিবে সতর্ক বার্তা দেবে। রোগ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

শরীরের সাথে মনের আছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শরীর ভাল তো মনও ভাল। কঠোর পরিশ্রমেও শরীরে কোনো রকমের অবসাদ আসে না। নিতান্তই সামান্য কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা জটিল রোগ হতে মানুষকে রক্ষা করে। কিছু কিছু রোগের লক্ষণ প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় সতর্ক না হলে পরবর্তীতে এসব রোগ জটিল আকার ধারণ করে। এ কারণেই স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ নিয়মিত হেলথ চেক আপ বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে থাকেন। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (যেমন হার্ট, লিভার, কিডনি) কার্যক্ষমতা অথবা অস্বাভাবিকতা জানা যায়। এসব কথা বিবেচনা করে ল্যাবএইড-এ বয়স, নারী ও পুরুষ ভেদে আলাদা বেশ কিছু হেলথ চেক-আপ প্যাকেজ আছে, যেমন- ল্যাবএইড হেলথ স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ চেক-আপ, এক্সিকিউটিভ চেক-আপ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ চেক-আপ, পঞ্চাষোর্ধ পুরুষ চেক-আপ, মহিলা স্বাস্থ্য চেক-আপ, কম্প্রিহেনসিভ কার্ডিয়াক চেক-আপ, ডায়াবেটিক চেক-আপ প্যাকেজ। উপরন্তু প্যাকেজ হওয়াতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যয় তুলনামূলক অনেক কম এখন।

নিচের এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপটি করে আপনার সুস্থতা যাচাই করে নিন। প্যাকেজটিতে যে ধরনের পরীক্ষা অর্ন্তভুক্তঃ

- Complete Blood Count (CBC)
- HbA1c
- TSH
- Serum Lipid Profile (Fasting)
- Kidney Function Tests (Blood Urea, Serum Creatinine, Serum Electrolytes)
- Serum Uric Acid
- Urine for R/M/E
- Liver Function Tests (Serum Bilirubin, SGPT, Alkaline Phosphatase)
- HBsAg
- Anti HBS
- Blood Group and Rh Factor
- USG of Abdominal Organs
- ECG
- X-Ray Chest P/A View

এক্সিকিউটিভ হেলথ চেক-আপ খরচ: ৮,৫০০/-

ল্যাবএইড
এখন ফরিদপুরে

হটলাইন | **০১৭৬৬৬৬৩১০০**

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ

ডাঃ মোঃ তৌহিদ আলম
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), এমএসিপি (ইউএসএ)
মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র, লিভার রোগবিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

ডাঃ এমএম শাহিন উল ইসলাম
এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি)
মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগবিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ফরিদপুর।

ডাঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ
এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (কার্ডিওলজি), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট
মেডিসিন, হৃদরোগ, বাতজ্বর ও বক্ষ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট, মেডিসিন।

ডাঃ সৈয়দ আসিফ উল আলম
এমবিবিএস, ডিঅর্থো, এমএস (অর্থো)
কনসালটেন্ট ও বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন
এক্স আরএস (ক্যাজুয়্যালটি)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ডাঃ ফাহমিদা জেসমিন
এমবিবিএস, এফসিপিএস (গাইনি)
বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমআরসিওজি-এফপি (লন্ডন)
প্রসূতি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
কনসালটেন্ট, গাইনি, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

ডাঃ গিয়াস উদ্দীন আহমেদ
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (শিশু)
এমডি (শিশু), পিজি হাসপাতাল নবজাতক ও শিশুবিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট, শিশু।

ডাঃ এসএম হাসান মুরাদ
এমবিবিএস (ঢাকা), পিজিটি (সার্জারি)
সিসিডি (বারডেম), সিসিসি (হৃদরোগ)
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা
ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন ও হৃদরোগ অভিজ্ঞ
আরএমও, ফরিদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ফরিদপুর।

ডাঃ এম. নুরুল আফসার (বদরুল)
এমবিবিএস (সিইউ) ডি-কার্ড (ডিইউ)
পিএইচডি (কার্ডিওলজি), এমডি (থিসিস)
সার্টিফাইড কোর্স অন ডায়াবেটোলজি (বারডেম)
কোর্স ইন এ্যাডভান্সড এন্ডোক্রাইনোলজি (সিঙ্গাপুর)
হৃদরোগ, বাতজ্বর, মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি)

ডাঃ মোঃ শফিক-উর রহমান
এমবিবিএস (সইউ); ডিএলও (ডিইউ); বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এফআরএসও (ইডিন, স্কটল্যান্ড, লন্ডন)
নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও হেড নেক সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ডাঃ শহীদুল ইসলাম
এমবিবিএস, এমসিপিএস (সার্জারি), এমএস (অর্থো)
স্পাইন সার্জারিতে উচ্চতর প্রশিক্ষাপ্রাপ্ত
মেম্বার এও স্পাইন এশিয়া প্যাসিফিক
অর্থোপেডিক ও স্পাইনসার্জন
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ
আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।

ডাঃ তাহমিনা আক্তার
এমবিবিএস (ঢাকা), এমডি (শিশু)
সিসিডি (বারডেম)
নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক (শিশুবিভাগ)

ডাঃ তাহমিনা আক্তার
এমবিবিএস, সিসিডি (বারডেম), এমডি (শিশু)
সহকারী অধ্যাপক (শিশুবিভাগ)
ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ।

ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন আহমেদ
প্যাথলজিস্ট এমপিএইচ, এমডি (প্যাথলজি)
প্রভাষক প্যাথলজি বিভাগ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ।

ডাঃ মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিশ্বাস
এমবিবিএস, ডিটিসিডি (জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট মহাখালী)
এফসিপিএস (ইউএসএ)
বক্ষব্যাধি অ্যাজমা, টিবি ও স্লিপ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক বক্ষব্যাধি বিভাগ
ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ।

কনসালটেশন
এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা মেডিসিন, লিভার, কিডনি, স্ত্রীরোগ ও বন্ধ্যাত্ব, জরায়ুরোগ, হাড় জোড়া ও পঙ্গু, ডায়াবেটিস, রক্তরোগ ও হৃদরোগসহ অন্যান্য বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

মেডিকেল চেক-আপ
ঝুঁকিপূর্ণ রোগ যেমন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি তেমন কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ ছাড়াই দেহের অভ্যন্তরে বেড়ে ওঠে, যা আপনার দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে; এমনকি ঠেলে দিতে পারে অকাল মৃত্যুর দিকে! তাই প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের উচিত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের সুস্থতা নিশ্চিত করা উচিত। সুস্থ থাকলেও বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা জরুরি। আর এ কারণে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় "ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক, ফরিদপুর" - এ রয়েছে বিশেষ "মেডিকেল চেক-আপ" এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ
ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক, ফরিদপুর।
মুজিব সড়ক, ৫/১, ফরিদপুর টাওয়ার, নীলতুলি, ফরিদপুর। ওয়েব : www.labaidgroup.com

স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শে ২৪ ঘণ্টা আপনার পাশে

আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য
যে কোন মোবাইল থেকে ডায়াল করুন

10606

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ
- ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট
- স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য
- অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
- হোম সার্ভিস*

* *প্যাথলজির জন্য নমুনা সংগ্রহ, ব্লাড প্রেসার ও ওজন পরীক্ষা, ইসিজি*

ল্যাবএইড গ্রুপ, বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ৮৬১০৭৯৩-৮, ৯৬৭০২১০-৩, ৮৬৩১১৭৭

ল্যাবএইড
কল সেন্টার
প্রতি মুহূর্তের স্বাস্থ্য সমাধান